পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায়ে ৬১ বর্ষ ❑ ১৯তম সংখ্যা

১৫ শাহাদত ১৩৭৮ হিঃ শাঃ ❑ ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৯ ঈসাব্দ

Revelation Rationality

Knowledge and Truth

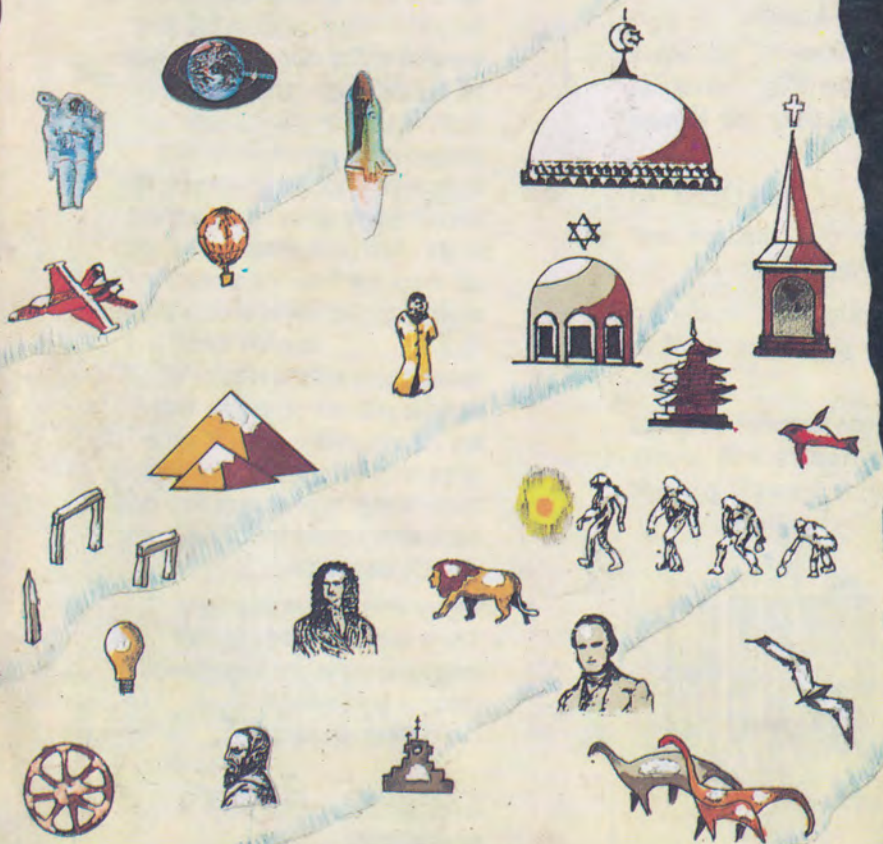

MIRZA TAHIR AHMAD

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

Revelation, Rationality, Knowledge and Truth

by : **Mirza Tahir Ahmad**

Any divide between revelation and rationality, religion and logic has to be irrational. If religion and rationality cannot proceed hand in hand, there has to be something deeply wrong with either of the two.

Does revelation play any vital role in human affairs? Is not rationality sufficient to guide man in all the problems which confront him? Numerous questions such as these are examined with minute attention.

All major issues which intrigue the modern mind are attempted to be incorporated in this fascinatingly comprehensive statute.

Whatever the intellectual or educational background of the reader, this book is bound to offer him something of his interest.

It examines a very diverse and wide range of subjects including the concept of revelation in different religions, history of philosophy, cosmology, extraterrestrial life, the future of life on earth, natural selection and its role in evolution. It also elaborately discusses the advent of the Messiah, or other universal reformers, awaited by different religions. Likewise, many other topical issues which have been agitating the human mind since time immemorial are also incorporated.

The main emphasis is on the ability of the Quran to correctly discuss all important events of the past, present and future from the beginning of the universe to its ultimate end.

Aided by strong incontrovertible logic and scientific evidence, the Quran does not shy away from presenting itself to the merciless scrutiny of rationality.

It will be hard to find a reader whose queries are not satisfactorily answered. We hope that most readers will testify that this will always stand out as a book among books – perhaps the greatest literary achievement of this century.

ISBN 1-85372-640-0

9 781853 726408

বর্তমান সময়ে দেশের জন্য করণীয়

বর্তমানে দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। এ অবস্থার দ্রুত উন্নতি না হলে দেশের ও দশের জন্যে যে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে তা বলাই বাহুল্য।

এ নিয়ে সদাশয় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। বিরোধী দলগুলোও ভাবছেন। এহেন পরিস্থিতিতে আমরা যারা ধর্মীয় জামাতের লোক, যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত নই; তাদেরও যথেষ্ট চিন্তিত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এ দেশে আমাদের জন্ম। এ দেশের জলবায়ু ও মাটির সাথে আমাদের অচ্ছেদ্য ও প্রাকৃতিক বন্ধন রয়েছে। সুতরাং এ দেশের ভাল-মন্দের সাথে আমরা কোন না কোনভাবে জড়িত। এ দেশের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ দেশের মানুষের শুধরানোর দায়িত্ব আমাদের সবচেয়' অধিক। কেননা, আমরা দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ করে যাচ্ছি। তবে এ কথা সত্য যে, আমাদের সেরকম ধনবল ও জনবল নেই। কিন্তু আমরা দোয়ায় বিশ্বাসী। আমাদের খোদা সর্বশক্তিমান। আমরা যদি আমাদের খোদার হুযূরে কায়মনোবাক্যে দেশের কল্যাণের জন্যে দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্যে আকুতি-মিনতি করে দোয়া করি তবে আমাদের বিশ্বাস এ অবস্থা আল্লাহ্‌তাআলা শুধরে দিতে পারেন। আমাদের প্রিয় ইমাম আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা (আইঃ) ইদানিং এক খুতবায় আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা দৃষ্টি-পটে রেখে আমাদের খোদার সকাশে দোয়ায় লেগে যাওয়া উচিত। তিনি (আইঃ) বলেছেন, "হে আহমদী তোমার চোখের পানি যেন শুকিয়ে না যায়। আজ কেবল তোমার চোখের পানি এই বাগানে জল সিঞ্চন করতে পারে। আল্লাহ্‌র রহমতের পানি এ আগুনকে নিভাতে পারে। . . . . . আজ যদি তোমরা এ অভাবগ্রস্ত মানব জাতিতে পরিত্যাগ করো; তবে আর কেউ নেই যে, মানুষের সহায় হবে। প্রত্যেক নেকী ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব আহমদীয়া জামাতের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আল্লাহ্‌র রহমতকে সাথে নিয়ে দোয়া করতে থাকো। দোয়ার মাধ্যমে চোখ থেকে যেন পানি ঝরতে থাকে . . . . . ।

আল্লাহ্‌র বান্দাদের ভালবাসতে শিখো, উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র ভালবাসাপ্রাপ্তি। যদি বান্দাদের ভালবাসো তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের ভালবাসবেন।"
(খুতবা জুমুআ ০৫-০২-৯৯ইং)

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬১ বর্ষ ॥ ১৯ তম সংখ্যা

২ বৈশাখ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ ❑ ২৭ যিলহজ্জ ১৪১৯ হিঃ কাঃ
১৫ শাহাদত ১৩৭৮ হিঃ শাঃ ❑ ১৫ এপ্রিল ১৯৯৯ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
জাভেদ এ, মতিন	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গ ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

ইসলামের আগমনের পরে প্রথমে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব এবং পরে মাদ্রাসা প্রভৃতির আকারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ লাভ ঘটে। আজকালকার যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে তা যে উপরোক্ত শিক্ষা ব্যবস্থারই ব্যাপকতর বিকাশ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজকে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কথা উঠেছে– পক্ষে এবং বিপক্ষে। এক সময়ে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী, হাজী শরীয়াতুল্লাহ, মাওলানা কারামত আলী প্রমুখ এ মাদ্রাসারই ফসল ছিলেন। মাদ্রাসায় পড়ে যারা বের হন প্রকৃত অর্থে তারা মানুষ গড়ার কারিগড়। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব ঐ সব লোকদের স্কন্ধে ন্যস্ত এবং একদিন ছিলোও তাই।

কিন্তু অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বহু জাল-ভেজাল প্রবেশ করেছে এবং একটু বেশীই, বল্লে অত্যুক্তি করা হবে না। ইদানিং কালের পত্র-পত্রিকা থেকে মাদ্রাসা বোর্ড ও মাদ্রাসা পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব রিপোর্ট আসছে তাথেকে তা-ই প্রতীয়মান হয়। স্কুল-কলেজের চালুনীর ফাঁক দিয়ে যারা গড়িয়ে পড়ে সেখানের বিদ্যা যাদের ঘটে প্রবেশ করে না ব্যাকডোর পলিসিতে একটি হিল্লা হয়ে যাওয়ার জন্যে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার যে অনেক কৃপা তা বলতে কার্পণ্য করা উচিত নয়।

মাদ্রাসা পরীক্ষায় বস্তায় বস্তায় কুরআন হাদীসের যে নকলের ছড়াছড়ি আল্লাহ্ এথেকে জাতিকে রক্ষা করুন! এমন কি এতে মুদাররেসগণের যে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, কেউ কেউ ধরা পড়ে 'লাল দালানে' বসবাস করছেন তা-ও খবরে প্রকাশিত হয়েছে। নকল করে পাশ করে কেউ যদি মানুষ গড়ার কারিগর হয় তাহলে তিনি যে ঈমান খানার বারটা বাজিয়ে ছাড়বেন তা বলতে দ্বিধা নেই। নকল করে পাশ করা ডাক্তার যেমন রুগী মারার সার্টিফিকেট পেয়ে থাকেন আর নকল করে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার তেমন দালান কোঠা ও পুল ব্রিজ ভাঙ্গার সনদপত্র পেয়ে থাকেন। নকল করা কখনও কল্যাণকর নয়। এসব স্থানে নকল করা আরও অনেক বেশী অকল্যাণকর।

মাদ্রাসা শিক্ষা এক পেশে শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসা থেকে পাশ করা লোকটি পেশা হিসেবে 'মৌলবী গিরী' ছাড়া আর কিইবা করতে পারবে? আজকে মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে যারা জড়িত তারা যে কুরআন, হাদীস ও রসূল (সঃ)-এর আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিজাতীয় রাজনৈতিক কৃষ্টিকে তাদের বাঁচার সম্বল হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। রাস্তায় যখন তারা অন্যান্যের সাথে পাল্লা দিয়ে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল, বোমা ফাটানো, রাস্তা বন্ধ করে দেয়া প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকেন তখন তারা যে নবী করীম (সঃ)-এর খায়রে উম্মত তা সনাক্ত করাই দায় হয়। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের পক্ষে বিশ্বাসী নই। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপকতা চাই বাস্তবতার ভিত্তিতে। আমরা চাই মাদ্রাসা শিক্ষাকে যেন ঢেলে সাজানো হয়। এর সাথে যেন কারিগরী শিক্ষা তথা জীবনের প্রয়োজনগুলোকে সামনে রেখ তা রচিত হয়। একজন মাদ্রাসা পাশ করা লোক যাতে কেবল মাত্র মসজিদ মাদ্রাসার কাজেই যোগ্য না হন যোগ্যতানুযায়ী তিনি যেন জীবনের অন্যান্য যে দিকগুলো রয়েছে সেখানেও যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন এবং জাতীয় কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেন সে দিকে দৃষ্টি রাখা জরুরী। এক্ষেত্রে নবী করীম (সঃ)-এর আদর্শ আমাদের চোখের সামনে। তিনি (সঃ) একাধারে যেমন মানুষের হেদায়াতের জন্যে অহোরাত্র সংগ্রাম করেছেন তেমনি নিজের খাবার লোকমাটিও নিজে আয় করে খেয়েছেন। শুধু নবী করীম (সঃ)-ই নন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পরবর্তী যুগ পর্যন্তও সকলে যেমন স্বোপার্জিত রুটি খেতেন তেমনি হেদায়াতের কাজও চালিয়ে যেতেন। কখনও পরভূক বা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকাকে পসন্দ করেন নি। এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ ঃ	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ হায়া (লজ্জা-বিনয়)	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ গুনাহ্‌সে নাজাত কিঁউকার মিল সাকতি হ্যায় হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ- জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৫-৬
❑ জুমুআর খুতবা ঃ এতীম ও বিধবাদের প্রতি দায়িত্ব হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৭-১১
❑ তৌযীহে মরাম (লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ) ঃ মূল- হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ- জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া	১২
❑ জুমুআর খুতবা ঃ ওয়াকেফীনদের নব প্রজন্মের প্রস্তুতির ব্যাপারে কিছু উপদেশ হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ- জনাব মুহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৩-১৬
❑ কারবালার ঘটনার সংক্ষিপ্ত পটভূমি : আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা মূল – মুহাম্মদ ইউসুফ আনোয়ার	ঃ অনুবাদ- জনাব মুহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৭-১৯
❑ এম, টি, এ- খোদার এক মহাদান মোহতরম মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন	ঃ অনুবাদ- মাওলানা বশীরুর রহমান	২০-২১
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২২-২৩
❑ যিকরে হাবীব	ঃ সংগ্রহ ও ভাষান্তর- ডা. শেখ হেলালউদ্দীন আহমদ	২৪
❑ ছোটদের পাতা ঃ আচিছ কাহানীয়াঁ- (ভাল ভাল গল্প) মূল : মিসেস বুশরা কুরায়েশী	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৫-২৭
❑ সত্যের অপলাপ	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২৮-২৯
❑ সংবাদ		৩০-৩১

প্রচ্ছদ : বিশ্বে সাড়া জাগানো পুস্তক Revelation, Rationality, Knowlege and Truth পুস্তকের প্রচ্ছদের চিত্র। এ পুস্তকখানা রচনা করেছেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রিয় ইমাম ও চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) (জন্ম-১৯২৮)

পুস্তক পরিচিতি

ওহী-ইলহাম ও যুক্তিবাদ, ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে যে কোন বিভক্তি অযৌক্তিক। যদি ধর্ম ও যুক্তিবাদ এক যোগে অগ্রগামী হতে না পারে তাহলে এদের উভয়ের যে কোন একটিতে কিছু একটা মারাত্মক গলদ রয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

মানুষের জীবন যাত্রায় ওহী-ইলহাম কি কোন মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে? যুক্তিবাদ যদি মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের পথে দিক-নির্দেশনা দিতে যথেষ্ট নয়? এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন গভীর মনযোগ সহকারে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আধুনিক মনের কৌতুহলোদ্দীপক সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয়াদি এ মনোমুগ্ধকর বিশাল গ্রন্থে সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠকের বুদ্ধিমত্তা বা শিক্ষাগত ভিত্তি যা-ই হোক না কেন, এ গ্রন্থখানা অবশ্যই তার কিছু না কিছু কৌতুহল মিটাবে।

বিভিন্নমুখী ব্যাপক ভিত্তিক বিষয়াবলীসহ এ পুস্তক খানা বিভিন্ন ধর্মে ওহী-ইলহামের ধারণা, দর্শনের ইতিহাস, সৃষ্টি-তত্ত্ব, অতি রাষ্ট্রিক জীবন ব্যবস্থা, পৃথিবীর ভবিষ্যত জীবন, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং বিবর্তনে এর ভূমিকা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেছে। ইহা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বা অন্যান্য ধর্মের প্রতীক্ষিত বিশ্ব সংস্কারকের প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছে। তাছাড়া অনাদি কাল থেকে আরও যেসব প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি মানুষের মনকে দোলা দিয়ে আসছে সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিশ্বের সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে এর শেষ পরিণতি পর্যন্ত ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিশেষ বিশেষ বিষয়াবলীর ওপরে কুরআনের সঠিক দিক-নির্দেশনার ওপরে সবিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

স্বীয় অকাট্য যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কুরআন করীম যুক্তিবাদকে চুলচেড়া বিচার করাতে পিছ পা হয় না।

পাঠকের জিজ্ঞাসাগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হয় নি এমনটি খুব কমই পাওয়া যাবে। আমরা আশা করি অধিকাংশ পাঠক ইহা সর্বদা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ইহা একখানা বই এর মত বই-সম্ভবতঃ বর্তমান শতাব্দীর সবচে' সেরা সাহিত্যিক অবদান।

বইখানা প্রকাশ করেছে ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস্ লিঃ।

নববর্ষের শুভেচ্ছা

বাংলা নববর্ষের শুভারম্ভ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

সূরা মায়েদা - ৫

৯৮। আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য চিরস্থায়ী উন্নতির[৭৯৪] উপায় করিয়াছেন পবিত্র গৃহ কা'বাকে ও পবিত্র মাসকে আর কুরবানীসমূহকে ও গলায় মালা পরিহিত পশুগুলিকেও। ইহা এইজন্য যেন তোমরা জানিতে পার যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সবই অবগত আছেন। আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

৯৯। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতীব কঠোর এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ও বটেন।

১০০। এই রসূলের উপর দায়িত্ব কেবল (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া আর আল্লাহ্ অবগত আছেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর ও যাহা তোমরা গোপন কর।

১০১। তুমি বল, 'অপবিত্র ও পবিত্র সমান হইতে পারে না,' যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে।[৭৯৫] অতএব, তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ ! যেন তোমরা সফলকাম হও। ১৩ রুকূ

১০২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না, যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইলে তোমাদের কষ্টের কারণ হইবে[৭৯৬] এবং যদি তোমরা কুরআন নাযেল করার সময়ে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হইবে। আল্লাহ্ ঐগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। আসলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

১০৩। তোমাদের পূর্বেও একজাতি এইরূপ (বিষয়াদি সম্বন্ধে) প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহার অস্বীকারকারী হইয়া গেল।[৭৯৭]

১০৪। আল্লাহ্ কোন বাহীরা,[৭৯৮] সাইবাহ্,[৭৯৮-ক] ওয়াসীলাহ্,[৭৯৮-খ] এবং হাম[৭৯৮-গ] নির্ধারণ করেন নাই, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধি-বিবেচনা করে না।[৭৯৮ঘ]

১০৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন উহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস', তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি উহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' কী ! যদিও তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণ না কোন জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে এবং না কোন হেদায়াত গ্রহণ করিয়া থাকে, তথাপিও (তাহারা অন্ধ অনুকরণ করিবে) ?

৭৯৪। মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির চিহ্নস্বরূপ কা'বার হজ্জকে আল্লাহ্ মনোনীত করিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত তাহারা হজ্জব্রত পালন করিয়া চলিবে, ততদিন আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহ তাহাদের উপর বর্ষিত হইবে। হজ্জ মানুষের জাগতিক জীবিকারও একটি প্রকৃষ্ট উপায়। লাখ-লাখ মুসলমান প্রতি বৎসর কা'বায় হজ্জ করিতে আসেন। ইহা মক্কাবাসীদের জীবিকা অর্জনের একটি বড় সম্বল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কেবল মক্কাবাসীদের জন্যই সীমাবদ্ধ নহে, বরং বিশ্বমানবের কল্যাণও এই প্রতিশ্রুতির আওতায় রাখা হইয়াছে। 'কিয়াম' দ্বারা ইহাও বুঝায় যে, এই শিক্ষা (নির্দেশ) চিরস্থায়ী, কখনও অবসান হইবার নহে।

৭৯৫। স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, অপরের অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া সংখ্যা-গরিষ্ঠদের অনুকরণ করে। এই আয়াত সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্ধ ও বিবেচনাহীন অনুকরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেছে।

৭৯৬। ইসলামী শরীয়তের তিনটি ভিত্তি রহিয়াছেঃ (১) কুরআনে অবতীর্ণ আইন, (২) রসূলে পাক (সঃ)-এর সুন্নাহ্ বা জীবনের কার্যধারা এবং (৩) আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশমালা, যাহা নবী করীম (সঃ)-এর সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান, উপরোক্ত মূল তিনটি ভিত্তির উপর রচিত আইনের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু ছোট-খাটো বিস্তারিত বিবরণাদি ও খুঁটি-নাটি বিষয়াদি, মৌলিক আইনের আলোকে যাচাই করিয়া নির্ধারিত করার ভার মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐসব খুঁটি-নাটির কথাই আয়াতে বলা হইয়াছে।

৭৯৭। অপ্রয়োজনীয় খুঁটি-নাটি বিষয়াদি সম্বন্ধে অধিক প্রশ্ন উত্থাপন করা কিংবা এই সব বিষয়ে আইন অন্বেষণ করা, প্রশ্নকারীর জন্য সাধারণতঃ ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে তাহার বিচার-বিবেচনা দমিত হইয়া পড়ে এবং তাহাকে অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর আদেশের আওতায় বাঁধিয়া ফেলে। বনী ইসরাঈল মূসা (আঃ)-এর কাছে এইরূপ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিত। ফল দাঁড়াইয়াছিল এই যে, তাহারা নিজেদেরকেই অসুবিধায় ফেলিয়াছিল এবং বিশদভাবে বর্ণিত খুঁটি-নাটি সবকিছু সম্পাদন করিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে আল্লাহ্র নির্দেশমালাকেও অমান্য করিতে শুরু করিল (২ঃ১০৯)।

৭৯৮। 'বাহীরা'–যে উটনী সাতটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করিত, পৌত্তলিক আরবগণ উহার কর্ণ ছিদ্র করিয়া মুক্তভাবে বিচরণের জন্য ছাড়িয়া দিত এবং বাধাহীনভাবে উহা যেখানে ইচ্ছা চরিয়া বেড়াইত। এইরূপ উট্নীকে 'বাহীরা' বলা হইত। ইহাকে কোন দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ইহার পিঠে কেহ চড়িত না এবং ইহার দুগ্ধও কেহ পান করিত না।

৭৯৮-ক। 'সাইবাহ্'–পাঁচ বাচ্চার জন্মদাত্রী উট্নীকে মুক্তভাবে খাদ্য-পানীয় গ্রহণের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ইহাকে বলা হইত 'সাইবাহ্'।

৭৯৮-খ। 'ওয়াসীলাহ্'–দেবতার নামে উৎসর্গীত উট্নী যে পর পর সাতটি মাদী-বাচ্চা প্রসব করিয়াছে, মুক্তি-প্রাপ্ত এইরূপ উট্নী (ভেড়ী বা বক্রী)-কে ওয়াসীলাহ্ নাম দেওয়া হইত। সপ্তম প্রসবে, একটি পুরুষ-বাচ্চা ও একটি স্ত্রী-বাচ্চা হইলেও, উহা সম্পূর্ণ মুক্ত-বিহারী হইত।

৭৯৮-গ। 'হাম',–সাত বাচ্চার পিতা-উট্কে 'হাম' বলা হইত। ইহাও মুক্তাঙ্গণের খাদ্য-পানীয়ের অধিকারী, ইহা না বোঝা বহন করিবে, না পিঠে মানুষ তুলিবে।

৭৯৮–ঘ। খুঁটি-নাটি ও বিস্তারিত স্বল্প-প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যাপারে মানুষ নিজের বিচার-বিবেচনা খাটাইয়া আইন করিয়া ব্যবহার-বিধি বানাইয়া লইতে পারে। এই আয়াতে আসিয়া বলা হইতেছে যে, এই বিচার-বিবেচনা খাটানোর অধিকার, মৌলিক বিষয়াদিতে প্রয়োগ করা যাইবে না। কেননা, মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন মতামত সৃষ্টি হইয়া গুরুতর ক্ষতি হইবে। আয়াতটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছে যে, মৌলিক বিষয়ে আইন-বিধি রচনা করার জন্য, মানুষের সীমিত বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। আরবেরা তাহাদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার মানসে তাহাদের গৃহ-পালিত পশুকে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিত যাহাতে উহারা যত্র তত্র অবাধে চলাফেরা ও পানাহার করিতে পারে। ইহা ছিল তাহাদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার-জনিত কু-বুদ্ধি। এই পন্থা বা আচরণ ছিল একান্তই অর্থহীন ও নির্বোধ। পশুগুলি যে দিকে যাইত ধ্বংসের ছাপ রাখিয়া যাইত। মানুষের আইনের মধ্যে যে কত খারাপিও থাকিতে পারে, এই উদাহরণ দ্বারা, কুরআন তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। খৃষ্টানেরা বলে, "শরীয়াত এক অভিশাপ"। কুরআন তাহাদিগকে হুঁশিয়ার করিয়া বলিতেছে, তাহারা যেন আরবদের পশু-মুক্তির উদাহরণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। আরববাসীদের সঠিক পথে চালনার জন্য কোনও অবতীর্ণ শরীয়ত ছিল না বলিয়াই, তাহারা এইরূপ নীতি-বিগর্হিত কাজে লিপ্ত হইয়াছিল ও তাহাদের বুদ্ধি-বৈকল্য ঘটিয়াছিল।

হাদীস শরীফ

'হায়া' (লজ্জা-বিনয়)

কুরআন ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ ﴿۲۵﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِیْ عَلَی
اسْتِحْیَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِیْ یَدْعُوْكَ لِیَجْزِیَكَ اَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا ؕ

অর্থাৎ ঃ সে বল্‌ল, হে আমার প্রভু ! তুমি যে কোন কল্যাণ আমার প্রতি নাযেল কর আমি অবশ্যই উহার ভিখারী। তখন রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তার নিকট আসলো। সে বল্‌লো, আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন, তুমি যে আমাদের জন্য (পশুপালকে) পানি পান করিয়েছ তিনি যেন তোমাকে উহার বিনিময় দান করেন (আল্ কাসাস ঃ ২৫-২৬ আয়াতাংশ)।

হাদীস ঃ

'আন যায়দিব্‌নে তালহাতা বিন রুকানাতা ইয়ারফাউহু ইলান নাবীয়্যে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা লেকুল্লে দিনীন খুলুকুন ওয়া খুলুকুল ইসলামে আল্‌হায়ায়ু **(মুআত্‌তা ইমাম মালেক বাবু মা যাআ ফিল হায়ায়ে)।**

অর্থাৎ ঃ হযরত যায়েদ ইবনে তালহা বিন রুকানা আঁ হযরত (সঃ)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেছেন যে, তিনি (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক ধর্মের এক বিশেষ (স্বভাবজাত প্রকৃতি রয়েছে) নৈতিকতা রয়েছে আর ইসলামের নৈতিকতা হলো 'হায়া' অর্থাৎ লজ্জা-শরম-বিনয় (মুআত্‌তা ইমাম মালেক)।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরের আয়াতে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে মাদইয়ান নামক স্থানের একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ঘটনাটি সাধারণ কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা ইহাকে কিয়ামত কাল অবধি সংরক্ষণ করলেন। হযরত মূসা (আঃ) ফিরআউন হতে মুক্তি পেয়ে বিদেশ বিভুইয়ে নিরুপায় হয়ে একটি কূপের কাছে বসেছিলেন। সেখানে একটি মেয়ে তাঁর (আঃ) নিকট এসে বল্‌লো, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, মেয়েটির চাল চলনে যে 'হায়া' (লজ্জা-শরম-বিনয়) ছিল আল্লাহ্‌তাআলা প্রশংসার সাথে উহার উল্লেখ করেছেন।

উপরোল্লেখিত হাদীসে হযরত নবী করীম (সঃ) যে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন তা হলো ইসলামের নৈতিকতা আর এর অর্থ হলো লজ্জা-শরম ও বিনয়। এসবগুলি অর্থ "হায়ার" মধ্যে নিহিত। বস্তুতঃ ইসলাম মানুষের নৈতিকতাকে উন্নত করে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাতে চায়। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে নৈতিকতায় উন্নতি করতেই হবে নতুবা খোদাতাআলার সাথে তার সম্পর্ক কখনই স্থাপিত হবে না। তিরমিযীতে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে যা উপরোক্ত বিষয়কে আমাদের সামনে আরো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বল্‌লেন "আল্লাহ্‌তাআলার হায়া হৃদয়ে সৃষ্টি কর। যেমন কিনা তাঁর সাথে লজ্জা করার হক রয়েছে। সাহাবীগণ (রাঃ) বল্‌লেন, আমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি আমাদিগকে 'হায়া' (লজ্জা-শরম-বিনয়) দান করেছেন। হুযূর নবী করীম (সঃ) বল্‌লেন, এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহ্‌তাআলার সাথে লজ্জা করার অর্থ হলো, তোমরা তোমাদের মাথা ও সেখানে নিহিত চিন্তা-ভাবনার হেফাযত কর। পেট ও উহার মধ্যে যে খোরাক তোমরা ভর উহার হিফাযত কর। মৃত্যু ও বিপদকে স্মরণ রাখো। যে আখেরাতের কল্যাণকে চায় সে জাগতিক চাকচিক্যের ধারণাকে পরিত্যাগ করে। সুতরাং যে এইরূপ জীবন যাপন করে সে সত্যই আল্লাহ্‌র সাথে হায়া করে" (তিরমিযী-কিতাবু সিফাতুল কিয়ামাতে)।

এই হাদীস আমাদের সামনে লজ্জা ও শরমের এক নতুন সংজ্ঞা তুলে ধরে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি এই সংজ্ঞানুযায়ী জীবন যাপন করবে সে দুই জাহানের কল্যাণে ভূষিত হবে। আর যে এই হায়াকে বাদ দিবে সে সকল ধরনের হীনকর্মে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে খোদা ও তাঁর রসূল থেকে দূরে সরে যাবে। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন হযরত নবী করীম (সঃ)-এর ফরমান অনুযায়ী নিজেদের জীবন যাপন করার প্রয়াশ চালাতে পারি (আমীন)।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী**

বিশেষ দোয়া

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯শে মার্চ ১৯৯৯ তারিখে জুমুআর খুতবায় জামাতকে নিম্নলিখিত তিনটি দোয়া বিশেষভাবে করার জন্য উপদেশ দান করেন ঃ

১।
رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۲۵۱﴾

"রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়া সাব্বিত্ আক্‌দামানা ওয়ান্‌সুরনা আলাল্ কাউমিল কাফেরীন," (সূরা বাকারা ঃ ২৫১)।

অর্থ ঃ 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর ধৈর্য শক্তি দান কর এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।'

২।
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِیْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۱۴۸﴾

"রাব্বানাগ্‌ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আম্‌রিনা ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ান্‌সুর্‌না আলাল্ কাউমিল কাফেরীন" (সূরা আলে ইম্‌রান ঃ ১৪৮)।

অর্থ ঃ 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করো, এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।

৩। رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا ﴿۸۱﴾

"রাব্বে আদ্‌খিল্‌নি মুদ্‌খালা সিদ্‌কিওঁ ওয়া আখ্‌রিজ্‌নি মুখরাজা সিদ্‌কিওঁ ওয়াজ্‌আল্ লি মিল্লাদুন্‌কা সুলতানান্ নাসীরা" (সূরা বনী ইস্‌রাইল ঃ ৮১)।

অর্থ ঃ হে আমাদর প্রভু ! তুমি আমাকে উত্তম প্রবেশে প্রবিষ্ট কর এবং আমাকে উত্তম বহির্গমনে বহির্গত কর এবং তোমার সন্নিধান হইতে আমার জন্য পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর।

নোট ঃ এই দোয়া তিনটি পবিত্র কুরআনের বিধায় নামাযে যেহেতু সিজদায় করা যাবে না, সেহেতু আত্‌তাহাইয়াত ও দরূদ শরীফের পরে অথবা রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে।)

সংকলনে ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী**

অমৃত বাণী

গুনাহ সে নাজাত কিউঁ কার মিল সাকতি হ্যায় ?
(পাপ থেকে কীভাবে মুক্তি লাভ করা যায় ?)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

(তৃতীয় কিস্তি)

হ্যাঁ, একথা সত্য যে, আরববাসীদের অত্যধিক যুলুম ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পর অন্যায় রক্তপাত ঘটানোর অপরাধে খোদাতাআলার দৃষ্টিতে যখন তারা ওয়াজিবুল কতল (মৃত্যুদন্ড লাভের অপরাধী) বলে সাব্যস্ত হয়, তখনই তাদের সকলের মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মৃত্যুদন্ড ক্ষমা করে দেয়া হবে যদি তারা বিশ্বাস আনয়ন করে। সম্ভবতঃ বিরুদ্ধবাদী নির্বোধেরা এই আদেশের কারণে ধোঁকায় পড়েছে। তারা জানে না যে, এটা বল প্রয়োগ নয় বরং মৃত্যুদন্ডের অপরাধীদের জন্য ইহা এক অনুকম্পাস্বরূপ, এটাকে বল প্রয়োগ বলে গণ্য করার মতো মূর্খতা আর হয় না। তারাতো হত্যাকারী হবার অপরাধে মৃত্যুদন্ড লাভের উপযোগী ছিলই, কাফের হিসেবে নয়। করুণাময় খোদা ভাল করেই জানতেন যে, ইসলামের সত্যতা তারা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে। সুতরাং তাঁর করুণা এটাই চাইলো যে, এরূপ মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধীদেরকে তাদের পাপ মোচনের আবারও এক সুযোগ দেয়া যাক। সুতরাং এতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, কাউকে হত্যা করা কখনো ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না বরং যারা রক্তপাত ঘটানোর কারণে মৃত্যুদন্ড লাভের যোগ্য ছিল তাদের জন্যও ক্ষমার একটি পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সেই যুগে সর্বত্র ইসলামকে এই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রত্যেক গোত্রে ঘৃণা-বিদ্বেষ এরূপ বেড়ে গিয়েছিল যে, কোন গোত্র থেকে কেউ মুসলমান হয়ে গেলে, হয় তাকে হত্যা করা হতো নয়তো তার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে দুর্বিসহ হয়ে যেতো। সেকালে সর্বত্রই ইসলামকে এই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমতাবস্থায় তখন শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইসলামকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং এরূপ অবস্থা ছাড়া ঐ সঙ্কটকালে ইসলাম কখনো যুদ্ধের নামও উচ্চারণ করে নি। ধর্মের নামে যুদ্ধ করা কখনো ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু যুদ্ধ করার জন্য অযথা ইহাকে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং যা কিছু ঘটেছে – নিজেদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার জন্যই তা হয়েছে। এরপর আবার অজ্ঞ মৌলভীরা এই বিষয়ের অপব্যাখ্যা করে এক নির্লজ্জ হিংস্রতাকে নিজেদের জন্য গৌরব মনে করছে। কিন্তু এটা ইসলামের অপরাধ নয়। এটা তাদের নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির অপরাধ যা মানুষের রক্তকে চতুষ্পদ জন্তুর রক্তের চেয়ে কম মূল্য দিয়ে থাকে। এখনও তাদের রক্তের পিপাসা মেটে নি বরং এ কারণেই তারা একজন খুনী মাহ্দীর প্রতীক্ষায় রয়েছে। 'ইসলাম এর প্রচারের জন্যে বলপ্রয়োগ ও যুলুমের মুখাপেক্ষী ছিল'–এ কথা যেন তারা সকল জাতির নিকট প্রমাণ করতে চাইছে। অথচ এতে সামান্যতম সত্যতারও লেশ মাত্র নেই।

বর্তমানে ইসলাম যেরূপ পতনোন্মুখ অবক্ষয়ের সম্মুখীন হচ্ছে–আমার মনে হয়, এখনকার যুগের কতক মৌলবী এতেও সন্তুষ্ট নন। উপরোক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ইসলামকে তারা আরও নিম্নস্তরে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু নিশ্চিতরূপে স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ চান না যে, ইসলাম এরূপ নিন্দা ও অপবাদের লক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত হোক। অজ্ঞ বিরোধীদের জন্য এটা বিরাট পরীক্ষা। তারা এখনো এই ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, প্রাথমিক ও পরবর্তী যুগে ইসলাম আপন জামাত বিস্তারের জন্য তরবারী ব্যবহার করেছে। আসলে বর্তমানে এটা সেই যুগ ও ক্ষণ যখন এই ভ্রান্তিকে দৃঢ় না করে অন্তর থেকে বের করে দিতে হবে। আজ যদি ইসলামের মৌলবীগণ একত্রিত হয়ে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন যে, তারা সভ্যতা-বিবর্জিত মুসলমানদের মন থেকে ভ্রান্তিকে উপড়ে ফেলবেন তাহলে নিঃসন্দেহে তারা জাতির প্রতি এক বিরাট কৃপা প্রদর্শন করবেন। শুধু এটাই নয় বরং এদ্বারা ইসলামের সৌন্দর্যের সুদৃঢ় ভিত্তির বিবরণ সাধারণের মাঝে প্রকাশিত হবে এবং ধর্ম বিরোধীগণ নিজেদের ভুলের কারণে ইসলাম সম্বন্ধে যে বিরূপভাব পোষণ করতো, তা দূর হতে থাকবে। তখন তাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে অচিরেই ঐ আলোর প্রস্রবণ থেকে আশীষ লাভ করবে। এটা জানা কথা যে, একজন খুনী ব্যক্তির নিকট কেউ আসতে পারে না, প্রত্যেকেই তাকে ভয় করে। বিশেষ করে শিশু ও মহিলাগণ তাকে দেখলে কেঁপে উঠে এবং তাকে এক পাগলের মতো দেখায়। অন্য ধর্মের একজন বিরোধী লোকও তার সাথে রাত কাটাতে ভীষণ ভয় পায় এই আশঙ্কায় যে, গাজী হবার সাধে রাতে উঠে তাকে না হত্যা করে ফেলে। কেননা, এই পুণ্য লাভের আশায় সীমান্তের কতক আদিবাসী আজও অন্যায়ভাবে হত্যা করে এই মনে করে যে–আজ আমি আমার এই একটি মাত্র কর্মের দ্বারা বেহেশ্‌ত লাভ করে এর সমস্ত পুরস্কারের ভাগী হয়ে গিয়েছি। মুসলমানদের জন্য এটা কত লজ্জার কথা যে, বিজাতীয়গণ তাদের প্রতিবেশী হয়ে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে না এবং সে নিজেদের মনকে কখনো প্রবোধ দিতে পারছে না যে, প্রয়োজনে এই জাতি আমার কোন উপকারে আসতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের এরূপ সুপ্ত বিশ্বাসের কারণে একজন বিজাতীয় লোক সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকছে।

এরকম একটি দৃশ্য আমি দেখেছি। সম্ভবতঃ এটা ১৯০১ সনের ২০শে নভেম্বরের ঘটনা। এক ইংরেজ ভদ্রলোক কাদিয়ানে এসেছিলেন।

আমাদের জামাতের অনেক লোক তখন উপস্থিত ছিলেন। কোন ধর্মীয় আলোচনা হচ্ছিল। তিনি এসে এক কোণে দাঁড়ালেন। আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে আমার পাশে বসতে দেয়া হলো। জানা গেল তিনি একজন ইংরেজ পর্যটক। আরব দেশও দেখে এসেছেন এবং তিনি আমাদের জামাতের ফটো তুলে নিতে চান। সুতরাং তার এ কাজে তাকে সহায়তা দিয়ে তার সমাদর ও মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এখানে কিছুদিন অবস্থান করার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু মনে হলো একথা শুনে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি তখন বল্‌লেন –আমি অনেক মুসলমানকে খৃষ্টানদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে দেখেছি। পরে বাগদাদে সংঘটিত এরূপ কয়েকটি হৃদয়হীন ঘটনার কথা তিনি শুনালেন। তখন বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে বুঝানো হলো – এই জামাত, যাকে আহ্‌মদী সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে, এরূপ মতবাদের ঘোর

বিরোধী এবং এরূপ লোকদেরকে অতি ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। মানবাধিকার সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের করণীয় হলো–ইসলামের মধ্য থেকে এরূপ ধারণার মূলোৎপাটন করে দেয়া। তখন তিনি মনে স্বস্তি পেলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের সাথে একরাত অবস্থান করলেন।

এই ঘটনাটি বলার উদ্দেশ্য হলো–মুসলমানদের এরূপ ধারণা, যা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত-বিজাতীয়দের জন্যে বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের মনে কু-ধারণা ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে এবং মুসলমানদের প্রকৃত সহানুভূতি সম্পর্কে তাদের সু-ধারণা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তা এরূপ লোকদের প্রতি রয়েছে–যারা ধার্মিকের জীবন যাপন করে না এবং ইসলামী অনুশাসন পালনে বিশেষ উদাসীন। অতএব, যেহেতু মুসলমানদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে যার জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী, সুতরাং এর চেয়ে বড় কোন পাপও কি হতে পারে যে, এক বিশ্বকে এরূপ ওলামা ও তাদের অনুসারীগণ ইসলামের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন ? তরবারীর ঝলক না দেখিয়ে যে ধর্ম নিজের শিক্ষা মানুষের মনে প্রবেশ করতে সমর্থ নয়, সে ধর্ম কি খোদার তরফ থেকে হতে পারে ? সে ধর্মইতো সত্য যা লৌহ-নির্মিত তরবারীর মুখাপেক্ষী না হয়ে আপন গুণাবলী, শক্তি ও অকাট্য দলীল-প্রমাণের দ্বারা তরবারীর কাজ সমাধা করতে সক্ষম।

এই হলো (ধর্মীয়) বিপর্যয়ের অবস্থা যা সতত একজন সংস্কারকের আগমনের দাবী জানিয়ে আছে। ইসলামের ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি তখন এরূপ ভয়াবহ অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যেন সূর্যগ্রহণ লেগে আছে এবং তার অধিকাংশই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, মাত্র অল্প কিছু বাকী রয়েছে। মুসলমানদের ব্যবহারিক আচরণের অবস্থা করুণাযোগ্য। এরূপ কতক হাদীস রচনা করা হয়েছে যা তাদের চারিত্রিক অবস্থার উপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তারা খোদাতাআলার নির্ধারিত বিধানের শত্রু। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঐশী বিধানে মানবজাতির জন্য তিন প্রকার অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে, যেমন-নিষ্পাপ কোন ব্যক্তিকে হত্যা না করা, নিরপরাধ কারও মান-সম্মানে আঘাত না করা এবং বিনা অধিকারে কারও ধন-সম্পদ হস্তগত না করা। কিন্তু আমি দেখছি কতক মুসলমান এ তিনটি আদেশই লঙ্ঘন করছে। একজন নিষ্পাপ লোককে হত্যা করেও ভীত হয় না। তাদের অর্বাচীন মৌলভীরা এরূপ ফতওয়াও দিয়ে রেখেছে যে, বিজাতীয় কোন নারীকে, যাকে তারা কাফের ও বিধর্মী বলে থাকে, কোন বাহানায় তাকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাওয়া অথবা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের স্ত্রী বানিয়ে নেয়া জায়েয (বিধিসম্মত)। আবার অনুরূপভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরি করে কাফেরদের মাল আত্মসাৎ করা যায়–এতে কোন পাপ হয় না। এখন চিন্তা করা দরকার–যে ধর্মে এরূপ খারাবী (ধর্মীয় বিপর্যয়) সৃষ্টি হয়ে যায় যাতে ফতওয়া দানকারী এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির মৌলভীও বর্তমান থাকে সে ধর্মের অবস্থা কীরূপ বিপজ্জনক ! স্বার্থপর লোক নিজেরা এরূপ ফতওয়া তৈরী করে খোদা ও রসূলের উপর মিথ্যারোপ করেছে। তাদের অনুসরণে অজ্ঞ সভ্যতা বিবর্জিতেরা যে পাপাচার করে যাচ্ছে তার সম্পূর্ণ দায়ভার তারা (মৌলবীরা) বহন করবে। তারা নেকড়ে। মেষের বেশে নিজেদেরকে প্রকাশ করে মানুষকে ধোঁকা দেয়। তারা জীবন বিধ্বংসী বিষ। কিন্তু নিজেদেরকে উত্তম প্রতিষেধক হিসেবে জাহির করে। তারা ইসলাম ও খোদার সৃষ্টির প্রতি কঠোর বিদ্বেষপরায়ণ এবং তাদের অন্তঃকরণ দয়া ও সহানুভূতিশূন্য। কিন্তু তাদের আসল চেহারা লুকিয়ে রেখে, স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা কপটতা-পূর্ণ ধর্মোপদেশ দান করে থাকে। ভক্তের বেশে তারা মসজিদে আসে কিন্তু দুষ্কর্মের স্বভাব গোপন থাকে। এটা শুধু কোন এক দেশেরই অবস্থা নয়, না কোন বিশেষ শহর বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের। বরং সারা ইসলামী দুনিয়ায় এরূপ এক দল রয়েছে যারা ওলামা হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় এবং মৌলবীদের আলখাল্লা পরে যথাসম্ভব ধার্মিকের রূপ ধারণ করে, যাতে করে তারা অতি মহৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু তাদের আচরণ সাক্ষ্য দিচ্ছে তারা কি এবং কোন্ প্রকৃতির লোক। তারা এটা চায় না যে, দুনিয়াতে সত্যিকারের পবিত্রতা ও প্রকৃত সহানুভূতি বিস্তার লাভ করুক। কেননা, এতে যে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি!

বস্তুতঃ বর্তমানে ইসলাম কঠিন বিপদে আক্রান্ত। অধিকাংশ আত্মারই মৃত্যু ঘটেছে। পুণ্যের দিকে এরা সামান্যও এগুচ্ছে না, মিতাচারকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে একদল করবপূজারী। কা'বা ঘরের ন্যায় তারা সেই কবরকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজেদের পীর সাহেবদের আত্মাকে তারা এরূপ শক্তিমান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অধিকারী বলে জ্ঞান করে, মনে হয় যেন খোদাতাআলার তরফ থেকে তাদেরকে সবকিছুর ক্ষমতা দান করা হয়েছে। অধিকাংশ পীরের আস্তানায় কবরও রয়েছে এবং অনুসারীরা পীরের আদেশে সেই কবর পূজো করে থাকে।

করববাসীর অলৌকিক গুণাবলী সম্বন্ধে কেউ জানতে চাইলে তার সম্বন্ধে অসংখ্যা মনগড়া অলৌকিক ঘটনাবলী শুনানো হয় যার একটিরও প্রমাণ নেই। তাদের মতে ইসলামের মূল হলো কবর পূজা এবং অপর সকল মুসলমানকে তারা পথভ্রষ্ট মনে করে। এটা সেই দল যারা বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করেছে। তাদের মোকাবেলায় এক বিপরীত অর্থাৎ হীনমন্যতার শিকার হয়েছে। অস্বীকার করার ব্যাপারে তারা সীমাতিক্রম করে গিয়েছে। আল্লাহ্‌র সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনতো দূরের কথা, এমনকি নবুওয়ত তাদের জন্য কোন জিনিস নয়। তারা অলৌকিকতার ঘোর বিরোধী এবং এ বিষয়ের উপর হাসি-বিদ্রূপ করে থাকে। ওহী বা দৈববাণী সম্বন্ধে তাদের ব্যাখ্যা এই– 'ওগুলো হলো কিতাবধারীর নিজেরই মনের ধারণা ও চিন্তার ফসল'। তাদের এমন ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনাকে সুন্দর করে গুছিয়ে নেবার বিশেষ দক্ষতা থাকে। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী যা প্রকৃত অদৃশ্যের খবর এবং যা তাদের বুদ্ধি-বিবেকের আওতা বহির্ভূত, এসবকে তারা অসম্ভব বলে মনে করে, ফলতঃ তাদের মতে খোদার নিকট থেকে না কোন ওহী অবতীর্ণ হয়, না মো'জেযা অর্থাৎ অলৌকিক বলে কোন জিনিস আছে এবং না ভবিষ্যদ্বাণী কোন তাৎপর্য বহন করে। মৃতের কবর শুধু মাটির স্তূপ যার সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই; মৃতের জীবিত হওয়া প্রাক-সভ্য যুগের কাহিনী এবং পরকালের জন্য চিন্তা করা উন্মাদনা মাত্র এবং বুদ্ধিমত্তার কাজ হলো – দুনিয়া উপার্জনের দক্ষতা অর্জন করা এবং যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পার্থিব কলাকৌশল নিয়ে দিবা-রাত্র ব্যস্ত থাকে তার অনুকরণ করা, তার মতো হয়ে যাওয়া (চলবে)।

অনুবাদ – **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

এতীম ও বিধবাদের কথা, অসহায় জনগোষ্ঠির কথা চিন্তা করা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দায়িত্ব

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা,৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) বলেনঃ গত জুমুআর খুতবায় এতীম, বিধবা, অসহায়, সমস্যা জর্জরিত মহিলা ও শিশুদের প্রতি করুণা প্রদর্শন সম্পর্কে কুরআন ও হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুন্নতের আলোকে একটি বক্তব্য আরম্ভ করেছিলাম। আজকেও ঐ বিষয়ে বক্তব্য রাখা আবশ্যক মনে করছি। কেননা, উহার কোন কোন উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও বাকী রয়ে গেছে।

সর্বপ্রথম আমি এমন লোকদের কথা উল্লেখ করছি যারা নিজেদের অন্তরের কঠোরতার কথা বলে থাকেন। অনেক সময় তারা বলেন যে, আমরা নম্রতা দেখাতে চাই কিন্তু আমাদের মধ্যে এক ধরনের কঠোরতা রয়েছে যা নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা নেই। এমন লোকদের জন্যে আঁ হযরত (সঃ)-এর উপদেশ কাজে লাগতে পারে (মুসনাদ আহমদ)। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে এক ব্যক্তি নিজ কঠোর মনোভাবের অভিযোগ করেছিলেন (মুসনাদ আহমদ)। দেখুন, মানব জীবনের কোন অবস্থা এমন নেই, যে সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ) কোন শিক্ষা দেন নি। সকল অবস্থায়, সকল সমস্যার সমাধান হুযূর (সঃ)-এর শিক্ষা থেকে পাওয়া সম্ভব এবং উত্তম সমাধান সেটাই হুযূর (সঃ) যে সমাধান দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তির অন্তরের কঠোরতা সম্পর্কে অভিযোগ করলে আঁ হযরত (সঃ)-এ সম্পর্কে বলছেন, যদি তুমি অন্তরের কঠোরতাকে দূর করতে চাও, তুমি দুঃস্থ মানুষকে খাবার খাওয়াও এবং এতীমের মাথায় স্নেহের হাত রাখ (মুসনাদ আহমদ)।

অর্থ এই যে, সরাসরি দুঃখের সম্মুখীন হয়ে স্বচক্ষে দেখা এবং তা দূর করার চেষ্টা করা। এতে করে নিজের অন্তরের কঠোরতা দূর হবে। নিজ গৃহে নম্রতা প্রদর্শনের অভ্যাস না থাকলে বাইরের দুঃখীদের সাথে নম্রতা দেখাবার যে আনন্দ এবং অভিজ্ঞতা এর দ্বারা নিজ গৃহের মানুষের সাথেও নম্রতা দেখানো সম্ভব। এটা অত্যন্ত গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নতের বাইরে কোথাও আপনি ইহা পাবেন না।

আর একটি হাদীস, হযরত মা'বীয়া কুশায়েরী (আবূ দাউদ) বর্ণনা করেছেন, "আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করেছিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ) আমাদের মহিলাদের সম্পর্কে কিছু বলেন"। আঁ হযরত (সঃ) এরশাদ করলেন, "তুমি নিজে যা খাও তা থেকে তাকেও খাওয়াবে"। তোমরা যেমন কাপড় পর তাদেরও তেমন কাপড় পরাবে। এমন না হয় যে, তোমাদের বাড়ীতে স্ত্রীরা ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াবে। যেহেতু বাইরে যাবে না - অতএব, ভাল কাপড় আবার কি পরবে? কেউতো জানবেও না যে, বাড়ীতে তারা কী পরে থাকে। অথচ তোমরা বাইরে যাও, খুব ভাল হয়ে উত্তম কাপড় পরে। আঁ হযরত (সঃ) বল্লেন, "তোমরা নিজেরা যেমন ভাল ভাল কাপড় পরিধান কর তেমনই স্ত্রীদেরও ভাল কাপড় পরাবে"। অর্থ এই নয় যে, পুরুষদের কাপড় পরাও বরং অর্থ যে, ভাল কাপড় যেমন তোমরা পর তেমনই তাদেরও পরাও। তাদের মারধর করবে না। গাল মন্দও করবে না।

সাধারণতঃ অনেক মানুষ কুরআন শরীফে যেমন আছে যে, মারধর করা যেতে পারে, এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে মারধর করে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, মারধর করবে না। গালিও দেবে না, সব সময় তাদের ভুল-ত্রুটি অন্বেষণ করবে না।

হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়, [বুখারী বাব ফাযায়েলে সাহাবা (রাঃ)] উল্লেখ আছে যে, হযরত আমর বিন মায়মুন বলেছেন যে, হযরত উমর বলতেন, আল্লাহ্তাআলা যদি আমাকে দীর্ঘজীবী করেন তবে আমি ইরাকের বিধবাদের অভাব দূর করণের এমন ব্যবস্থা করব যেন কখনও তারা কারো মুখাপেক্ষী না হয়। হযরত উমর (রাঃ) ইরাক সম্পর্কে যে আশা করতেন, যে দেশের বিধবা ও এতীমদের জন্য এমন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, সেই ইরাকের মহিলা ও শিশুরা আজ বেদনায় কাতরাচ্ছে। খুব স্মরণ করছে। এক উমরের অপেক্ষা করছে। সারা পৃথিবীর একই অবস্থা- পৃথিবীতে বিধবা ও শিশুদের আশ্রয় দেবার আজ কেউ বাকী নেই। হযরত উমর (রাঃ)-এর এই উদ্ধৃতি আমি বিশেষ করে এজন্যে এখানে শুনিয়েছি যে, **আপনারা এদের সকলের জন্যে দোয়া করবেন। এরা যুলুমে জর্জরিত যে, এদের সাহায্য করারও কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। দোয়াই একমাত্র অবলম্বন রয়ে গেছে।**

যে দেশে বিধবা এবং এতীমদের দেখা শোনা করার কেউ থাকে না, সে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে শেখ সা'দীর বুস্তানে উল্লেখ আছে। "তোমরা দেখেছ যে, এক বিধবা একটি প্রদীপ জ্বালিয়েছিল যদ্বারা সমস্ত শহর জ্বলে গিয়েছিল, সকলেই পুড়েছিল।" বড়ই গুরুত্বপূর্ণ কথা। এক বিধবার একটি প্রদীপের আগুনে সমস্ত শহর জ্বলে গিয়েছিল। ঐ বিধবা কেমন প্রদীপ জ্বালিয়েছিল ? অর্থ এটা নয় যে, ঐ বিধবা নিজ ঘরে একটি প্রদীপ জ্বালিয়েছিল-যদ্বারা শহর জ্বলেছিল। বরং আসলে তার অন্তরে ব্যথা ও বেদনার আগুন জ্বলেছিল। তোমরা হয়ত দেখেছ যে, বিধবার অন্তরের প্রজ্জ্বলিত ঐ আগুনে শহর জ্বলে গিয়েছিল। আজ তো এক শহরের কথা নয়, সারা দেশ জ্বলছে। এমন দেশ যে দেশে এতীম ও বিধবার কান্না থামাবার ব্যবস্থা নেই, গরীব অসহায়রা কেঁদে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। অনেকে নিজেকে জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করছে। তাদের খোঁজ-খবর করার কেউ নেই। এমন দেশ জ্বলবে না তো কি হবে ? ঐ অসহায়দের কান্না, বুকের আগুন সারা দেশকে আগুনে নিক্ষেপ করবে এবং করছে। এদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করার ভেবে দেখার কেউ নেই। এতীম ও বিধবাদের বিষয়টি অনুধাবনের জন্যে শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেও হবে না - মেধা ব্যয় করে চিন্তা করতে হবে। যারা অনুভব করে তারা তো অন্তর্দাহ বোধ করবেন। কিন্তু বিবেকবানরা এর সমাধানও চিন্তা করুন। আমি আহ্মদীদের বলছি, আপনারা শুধু অনুভব করবেন না। এদের সাহায্যের উপায়ও চিন্তা করুন। নিজের আশপাশের পরিবেশকে

প্রভাবিত করুন, আলোকিত করুন। যেখান থেকে আলো বিকশিত হয়ে অন্যান্য অঞ্চলও উদ্ভাসিত হোক। এহেন হিতোপদেশ ইতঃপূর্ব্বেও দিয়েছি, আবার স্মরণ করাচ্ছি। যে দেশে যেখানেই থাকুন-গরীব, অভুক্ত, পিপাসায় কাতরাচ্ছে, কিন্তু কেউ তার সাহায্যের জন্য এগুচ্ছে না- আপনি নিজে অগ্রসর হোন। বিষয়টি নিজ হাতে নিন এবং একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করুন। অনেক সময় একজনের ব্যক্তিগত সার্মথ্য স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও খুব ভাল ফল বেরিয়ে আসে। বড় সুদূর প্রসারী ফলাফল সৃষ্টি হয়। এখানে একথাও উল্লেখ করছি যে, যখন আমি এতীমদের কথা বলছি- তখন ব্যাপক অর্থে বলছি। কেবলমাত্র পিতৃহীনদের কথা বলছি না বরং সহায় সম্বলহীনদের কথা বলছি। কারণ, উর্দূতে এতীম অর্থ কেবল পিতৃহীন নয়, সহায় সম্বলহীন বুঝায়। অনেক সময় বিবাহিত পুরুষকেও এতীম বলা হয়। অনেক সময় বিবাহিতা মহিলা যে সন্তানের মা হয়ে গেছে, তার অবস্থাও এতীমের মত। শাব্দিক অর্থে বিধবাতো নয় কিন্তু বড় কষ্টদায়ক অবস্থা।

স্মরণ রাখা দরকার যে, কেবল মাত্র স্ত্রীরাই নিগৃহিত হয় না, নির্যাতিত হয় না। অনেক সময় পুরুষও নির্যাতিত হয়। এমন নির্যাতিত হয় যে, বলা যায় যে, এতীম অসহায় হয়ে পড়ে আছে। ঘরে তার খোঁজ খবর করার কেউ নেই। এতীম মূলতঃ এক ধরনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার নাম। যার কারণে বহু প্রকারের অসহায়ত্ব সৃষ্টি হয়। স্ত্রীরা অনেক বেশী অত্যাচারিত। এ সম্পর্কে বহুবার খুতবায় বলেছি। কিন্তু নিগৃহিত পুরুষরা বলেন, আমরাও বড়ই অসহায়, আমাদের কথাও তো বলুন। এমন পুরুষ অনেকেই আছে, যারা অনেক সময় বাড়ীর বাইরে কাটিয়ে দেয়। কারণ ঘরে তাদের অশান্তি। এ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তি তার বন্ধুকে নিজের ব্যস্ততার কথা শোনাচ্ছিল যে, দেখ, আমার কত কাজ! আমি এত ঘন্টা অফিসে কাজ করি। তারপর এত ঘন্টা আমি অমুক অমুক দোকানে কাটাই। এত ঘন্টা অমুক জায়গায় অমুক কাজ করি। বাড়ীতে থাকার জন্য মাত্র ২/৪ ঘন্টাই বাকী থাকে। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, তুমি আরামের সময় পাও না ? ঐ বন্ধু বল্‌ল যে, ঐ যে এখানে সেখানে কাটাই ঐ তো আরামের সময়। আমার বাড়ীতে আযাবের জায়গা। এমন হতভাগাও আছে। যাকে স্ত্রী নির্যাতন করে। 'এতীম' শব্দের বড় ব্যাপক অর্থ আছে। এ দৃষ্টি-কোণ থেকে জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি।

এমন পুরুষ যারা এত দুর্বল যে, স্ত্রীরা নির্যাতন চালাচ্ছে আপনারা সরাসরিতো কোন সাহায্য করতে পারবেন না। কারণ এদের মধ্যে যখন একবার এমন দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েই গেছে, তখন এদের আর কোন উপায় নেই। এমন পুরুষদের উপর তাদের স্ত্রীরা সর্বদা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকবে, কারণ তাদের দুর্বলতা রয়েছে। যার চিকিৎসা এখন নয়। সর্বদাই এমন হয়ে থাকে। সকল দেশের সাহিত্যে পুস্তকে এমন এমন মুখরোচক গল্পে ভরা আছে। স্ত্রীরা হামেশাই এমন স্বামীর উপর শাসন করে এসেছে। আর স্বামীরা কখনও স্ত্রীকে শাসন করতে পারে নি। আমারও এমন অনেক পুরুষের সম্পর্কে জানা আছে। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এ রকম অবস্থায় স্ত্রী কখনও সুখী হতে পারে না। অতএব, আমি এ বিষয়ে স্বামীদের বদলে স্ত্রীদের উপদেশ দিতে চাচ্ছি। এমন স্বামীরা, এমন নিরুপায়, তারা এর পরে ভবিষ্যতে কিছু করতে পারবে না। এখন তারা অসহায় এতীমদের মত। কিন্তু স্ত্রীদের নিজেদের বিচার-বিবেচনা করা উচিত, কারণ তারা স্বামীকে শাসন-ক্ষমতা না দিয়ে কখনও নিজেরা জীবনে সুখী হবে না। আর না তাদের সন্তানরা সুখী হতে পারবে। আর না তাদের সন্তানের তরবীয়ত হতে পারে। কারণ আল্লাহ্ পুরুষকে পরিবারের পরিচালক (শাসক) ও অভিভাবক বানিয়েছেন। যে স্ত্রীর শাসক-ক্ষমতা বা অভিভাবকত্ব তার নিজের হাতে থাকে- সে আসলে অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ এভাবে প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু কোন উপায় নেই। স্ত্রীদের বিচার-বিবেচনা করা উচিত। বুঝা উচিত তারা যেন স্বামীকে যথাযথ সম্মান করে এবং মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করে, নিজেদের গৃহে বা নিজ পরিবারের জন্যে জান্নাতের পরিবেশ সৃষ্টি করে। যদি স্ত্রীরা নিজ গৃহকে স্বামীর জন্যে জান্নাতের মত করে রাখে, তবে তার সন্তানেরাও জান্নাতের পরিবেশ পাবে। স্ত্রীরা যদি নিজ গৃহকে স্বামীর জন্যে জান্নাত না বানায় তবে তার সন্তানরা মায়ের পদতলে জাহান্নাম তো পেতে পারে, জান্নাত কখনও পাবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এমন মায়েরা যারা স্বামীর সম্মান করে না, তাদের সন্তানরাও বেআদব হয়ে যায়। কারণ মা স্বামীর সাথে বেআদবী করে। এমন সন্তানেরা কেবল মাত্র পিতার সাথেই বেআদবী করে না, মায়ের সাথেও বেআদবী করে। এসমস্ত কথা চিন্তা-ভাবনা করে আমি দেখেছি যে, এমন স্বামী যারা স্ত্রীর সামনে হেয় হয়ে থাকে এদের আমি নসিহত করতে পারব না। মৃত্যু ছাড়া তাদের এ অবস্থার তো সংশোধন হবে না। অতএব, স্ত্রীদের নসিহত করা উচিত। এতে তাদেরই কল্যাণ নিহিত আছে।

স্ত্রীদের জন্যে আর একটি দিক রয়েছে। বিধবাদের মাথার উপর করুণার হাত রাখার একটি অর্থ এই যে, বিধবাদের বিবাহ করানো প্রয়োজন। নতুবা তাদের উপর করুণার হাত প্রসারিত না হয়ে যুলুমের হাত উঠে যেতে পারে। বিধবাদের জন্যে ইসলামী ফিকাহ্‌শাস্ত্র মতে তারা এক প্রকারের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। তারা নিজেরাই ওলী হতে পারে। অন্য ওলীর প্রয়োজন নেই। এমন হিংস্র পুরুষও হয়ে থাকে, যারা বিধবাদের উপর করুণার হাত রাখতে গিয়ে তাদের রক্ত-পিপাসু হয়ে যায়। এ বিষয়ে কুরআনের সমাধান এই যে, বিধবাদের বিবাহ হয়ে যাওয়া উচিত। আঁ হযরত (সঃ) এ বিষয়ে খুবই বেশী বেশী জোর দিয়েছেন। হুযূর (সঃ) বলেছেন, বিধবাদের বিয়ে করিয়ে দেয়া উচিত এবং তোমরা তাদের বিয়ে দিয়ে দিবে।

আমাদের দেশের সমাজ এই পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে মনে করা হয় যে, বিধবারা যদি স্বামীকে স্মরণ করে বসে থাকে, পুনর্বিবাহ না করে, তবে এটা তাদের জন্যে খুবই ভাল এবং সংগত। এটা বড় যুলুম। এমন পরিবেশ বড় যুলুমের পরিবেশ যা বিধবাদের বিবাহের বিপক্ষে। বিধবাদের জন্যে চাপ সৃষ্টি করা হয় যে, পুনর্বিবাহ না করাই বিধবার জন্যে সম্মানের কারণ। হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ্ প্রথা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রচলিত ছিল। মুসলমানদের উচিত সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। ঐ বিধবা যে জানে যে, এখন আজীবন তাকে ধৈর্যব্রত পালন করে যেতে হবে। বড় কঠোর জীবন ব্যবস্থা। এমতাবস্থায় তারা অনেক সময় মৃত্যু বরণ করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করে। ঐ সময় হিন্দুদের মেয়েরা বেশীর ভাগ সতীদাহ্ প্রথা বেছে নিয়েছিল, আজীবন জ্বলতে থাকার চেয়ে একবার জ্বলাকেই শ্রেয়ঃ মনে করত। সুতরাং মুসলমানদের উচিত ছিল, হিন্দুদের ঐ সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং বিধবাদের বিবাহের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিচার করা।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "যদি কোন স্ত্রীর স্বামী মারা যায় যদি সে নিজে কম-বয়সীও হয় তবুও পুনর্বিবাহকে সে এত খারাপ মনে করে যেমন কোন বড় "কবিরা গুনাহ্" এবং সারা জীবন বৈধব্যব্রত পালন করে, মনে করে যে, আমি বড় পুণ্যের কাজ করেছি এবং সে সতী নারী হওয়ার সনদও পেয়ে যায়। অথচ তার জন্যে

বিধবা হয়ে থাকাকে বড় কঠিন পাপ কাজ বলে মনে করা উচিত ছিল।"

অতএব, আহ্‌মদীদের মধ্যে যে সব বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্ভব তাদের পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত। কোন কোন বিধবা এমন হতে পারে যাদের বিবাহ বিভিন্ন কারণে সংগত নয়, তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা চিন্তা করা যেতে পারে। কিন্তু হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলছেন, বিধবার জন্যে বিধবা হয়ে থাকা বড় গুনাহের কাজ। এমন স্ত্রীলোকদের জন্যে পুনর্বিবাহ করা অনেক বড় পুণ্যের কাজ। প্রকৃতপক্ষে এমন স্ত্রী লোকেরা বড় পুণ্যবতী এবং ওলীর (আল্লাহ্‌র বন্ধু) পর্যায়ে যারা বিধবা অবস্থায় থেকে মন্দ কথা চিন্তার ভয়ে পুনর্বিবাহ করে নেয়। তারা খামাখা বেআদব মহিলাদের তির্যক কথা-বার্তার ভয়ে ভীত হয় না।"

এখানে যারা পুনর্বিবাহ করতে চায় না তাদের জন্যেও হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) একটা পথ খোলা রেখেছেন। হযরত আকদস (আঃ)-এর বার্তা এদিক থেকে বড় জ্ঞানগর্ভ। হযরত (আঃ) যে বিষয়ে হিতোপদেশ দেন তার প্রতি সকল দিক থেকে দৃষ্টি রাখেন। বিভিন্ন প্রকার ব্যতিক্রমের পথও খোলা রাখেন। দেখুন, এখানে বল্‌লেন ঐ "বিধবারা খুব ধর্মমতী যারা মন্দ চিন্তা বা মন্দ কথার উদ্রেগ হতে পারে ভেবে বিবাহ করে নেয়।" এখন এমন স্ত্রীদের জন্যে সুযোগ রেখেছেন যারা এমন পর্যায়ে চলে গেছেন যাদের বয়ঃবৃদ্ধির কারণে বা কোন কারণে মন্দ কথার উদ্রেক হবার সম্ভবনাই থাকে না, এমন বিধবারা যেন মনে না করেন যে, আমাদের জন্যে সতর্কবাণী যে, পুনর্বিবাহ না করলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হতে পারেন। তাদের জন্যে মুলতঃ ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। কোন কোন এমন কম বয়সী স্ত্রী লোকও হতে পারেন যারা এমন মনের অধিকারী যে, তাদের মনে মন্দ কথা সৃষ্টি হয় না বা হবে না। তাদের জীবন যাত্রা এরকম যাদের প্রতি কারো মন্দ দৃষ্টি পড়তেই পারে না। অতএব, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে শর্ত রেখেছেন, মন্দ চিন্তা জাগ্রত হতে পারে। অথবা মন্দ আচরণের মহিলাদের মন্দ কথা থেকে ভীত হয় না। অর্থাৎ যারা বিধবাদের বিবাহের বিপক্ষে মন্দ ভাষা ব্যবহার করে এমন স্ত্রী লোকেরা ভাল নয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) এ সম্পর্কে কুরআন শরীফের আয়াতের আলোকে একটি বড় সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, "ওয়াল্লাহো আযীযুন হাকীম।" কারণ মানুষ বিধবা বিবাহের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে থাকে যে, বিধবা বিবাহ আমাদের বংশ মর্যাদার বিরুদ্ধে, তাই আল্লাহ্ বলেছেন, আমার নাম "আযীয" এর অর্থ আমি সবচেয়ে বড় মর্যাদার অধিকারী, আমি সবচেয়ে বড় সম্মানের অধিকারী হয়ে আদেশ দিচ্ছি যে, বিধবা বিবাহ কর এবং করাও। তোমাদের এমন কি মর্যাদা থাকতে পারে যে, সকল মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্‌র আদেশের বাইরে মর্যাদার কথা চিন্তা কর, তোমাদের সকলের মর্যাদা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করার মধ্যে নিহিত। মানুষ বলে যে, বিধবা বিবাহ অসংগত। এ জন্যে আল্লাহ্ বলছেন, আমি হাকীম আমি হিকমত বা প্রজ্ঞার বাদশাহ্। আমি জানি বিধবার বিবাহ প্রজ্ঞার বাইরে নয়, অতএব, যারা বলে যে, বিধবা বিবাহ অসংগত, তারা মিথ্যা বলে। অতএব, আল্লাহ্ বলেছেন, আমি হাকীম। অতএব, আমি খুব ভাল জানি কোথায় কী কাজ যুক্তি সংগত। অতএব, আমি বলছি, বিধবা বিবাহ অসংগত নয় [বদর (কাদিয়ান) ২৯ এপ্রিল, ১৯০৯ ইং]।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) লিখেছেন, "জাতির চরিত্রের সংশোধনের নিমিত্তে বিধবাদের যেন অবিবাহিত না রাখা হয়।" (বিধবাদেরও অধিকার আছে, সমাজেরও কিছু অধিকার আছে।) এবং তাদের বিবাহ করিয়ে দেয়া উচিত। অনুরূপভাবে দাসদের এবং স্ত্রীহারা পুরুষদেরও যেন বিয়ে করিয়ে দেয়া হয়" (তফসীরে কবীর, ৬ষ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪৫)। গোলামের কথা এজন্যে উল্লেখ হয়েছে, এখানে কুরআন তফসীর করতে গিয়ে আয়াতে গোলামদের কথার উল্লেখ রয়েছে, তাই এখানে গোলামের কথার উল্লেখ হয়েছে, নতুবা গোলামী তো অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আরো বলছেন, বিবাহের প্রসঙ্গে আর্থিক সংকটের কথা যেন প্রধানতঃ সমস্যা আকারে বিবেচিত না হয়। হ্যাঁ, যারা বিবাহ করতে পারেই না কোনক্রমে, তারা যেন বিশেষভাবে চরিত্র রক্ষার প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখে।"

"বিয়ে করতেই পারে না "- এর মধ্যে আরও একটি বিষয় রয়েছে যে, প্রত্যেক বিধবা অনেক সময় ইচ্ছা করলেও বিয়ে করতে পারে না। অনেকের চেহারা এমন হয় বা অন্য সমস্যা থাকে ফলে কেউ বিয়ে করে না। এমতাবস্থায় ঐ মহিলা কী করতে পারে। বিয়ে করতে রাজি হয় এমন পুরুষও তো থাকতে হবে। এখানে আমার মনে পড়ে গেল, ইংল্যান্ডের এক প্রধান মন্ত্রির কথা। তিনি একবার জাতীয় সংসদে বড় চমৎকার এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার নীতি হবে এই যে, আমরা মনে করি, "প্রত্যেক মহিলার বিয়ে হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সকল পুরুষের বিয়ে আবশ্যক নয়।" এত করে, বুঝা যায় যে, সমস্ত মহিলার বিয়ে হবে না। কারণ সকল পুরুষ যদি বিয়ে না করে তবে সকল মহিলার বিয়ে কি করে হবে। তিনি নিজ থেকে বড় যুক্তিসংগত কথা বলেছিলেন। "আমার নীতি এই যে, সকল মহিলার বিয়ে হওয়া উচিত কিন্তু সকল পুরুষকে বিয়ের আদেশ দিতে পারি না।"

এমনও বিধবা হবে যারা ইচ্ছা করলেও বিয়ে করতে পারবে না। এমন বিধবাদের জন্য হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন, সে যেন নিজের চরিত্র রক্ষার প্রতি খুব কড়া ও সজাগ দৃষ্টি রাখে। কেবল বিধবাই নয়, বরং এমন কুমারী কন্যারাও যাদের বিয়ের বয়স হয়েছে কিন্তু বিয়ে হতে দেরী হচ্ছে তারাও নিজের চরিত্র রক্ষার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখবে। তাদেরও চেষ্টা থাকবে সমাজও সামগ্রিকভাবে সচেষ্ট হবে।

এমন বিধবাও আছে যারা সন্তানের লালন-পালন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সন্তানদের কারণে পুনর্বিবাহ করা তাদের জন্য হয়ে উঠে না। এদেরও অপরাধ নেই, যদি তারা চরিত্র রক্ষা করে যায়। চরিত্র রক্ষার পদ্ধতি এই যে, তাদের চাল-চলন, উঠা-বসা, চলা-ফেরার ধরন বদলে যায়। সবাই বুঝতে পারে, তার সন্তানরাও বুঝতে পারে যে, তারা একজন পবিত্র চরিত্রের মায়ের কোলে জীবন যাপন করছে।

অতএব, এমন কোন বিধান তো রচনা করা যায় না যে, কেউ বিধবা হওয়ার সাথে সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতেই হবে কিছু না দেখে, না শুনে। বিবেচনা করে দেখা দরকার যে, তার ছেলেমেয়ের দেখা-শোনা কে করবে। কোন সময়, শরীয়তের একটি আদেশ অপর একটি আদেশের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে বিধবাদের প্রতি খেয়াল রাখার আদেশ আছে। সেখানে এতীমদের প্রতি খেয়াল রাখারও নির্দেশ আছে। কোন মা যদি মনে করেন যে, তার পুনর্বিবাহের কারণে তার এতীম সন্তানদের ভবিষ্যত অন্ধকারে ছেয়ে যাবে এমতাবস্থায়, শরীয়তের একটি বিধানের বিপরীত অন্য একটি বিধানের বাধা এসে দাঁড়ায়, ফলে কোন এক বিধবা যদি বিয়ে না করে তবে তাকে বিধান অমান্যকারী বলা যায় না। কিন্তু শর্ত এই যে, চরিত্র রক্ষাকারী হতে হবে তাকে। অবশেষে কাদিয়ানের একটি অসাধারণ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করব, দোয়ার জন্য। একজন একটা চেষ্টা নিয়েছিলেন যা আজ অনেক বড় আকার ধারণ করেছে। কত

সামান্য টাকার বিনিময়ে একজন কতবড় পরিশ্রম করেছিলেন যার ফল আজ সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। একটি দোয়ার আবেদন হিসাবে বিষয়টি উল্লেখ করছি। কাদিয়ানে ছোট্ট আকারে যে একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল, আজ তা বিরাট অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা ঐ ছোট্ট ভিত্তিটিকে বিনষ্ট করেন নি।

আমার ইংগিত হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক (রাঃ)-এর প্রতি যাঁর যিকরে খায়ের করছি। তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ এতীম-সেবক, এতীম-প্রেমিক ছিলেন। এতীমদের সেবার ময়দানে তাঁর নাম এতীমদের সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যা কখনও পৃথক করা যাবে না। এ সম্বন্ধে কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলো ধরছি।

এক সময় এতীমদের জন্য জামাতের মধ্যে যথারীতি কোন ব্যাবস্থাপনার প্রতিষ্ঠান ছিল না। এতীমদের সুব্যবস্থা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল। এতীমদের সেবাকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক (রাঃ)। ১লা মে, ১৯২৬ ইং তারিখে হযরত মীর সাহেব (রাঃ) 'দারুশ শূয়ুখ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম 'দারুল ইয়াতামা' না রেখে তিনি 'দারুশ শূয়ুখ' রেখেছিলেন। কারণ এতীম অর্থ শুধুমাত্র পিতৃহারা নয় বরং সকল বয়সের অসহায় মানুষ। এমন বৃদ্ধও আছে যে, তাদের যদি ছেড়ে দেয়া হয়, খেয়াল না রাখা হয়, তবে তারা অত্যন্ত খারাপ ও ভয়ানক অবস্থায় পড়ে যাবে এতীমদের মত। হযরত মীর সাহেব (রাঃ)-এর দায়ূশ শূয়ুখে বিভিন্ন বয়সের অসহায় মানুষেরাও যথেষ্ট সংখ্যায় স্থান পেয়েছিল। হযরত মীর সাহেব ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। এমনকি অর্থ সংগ্রহও তিনিই করতেন। "ব্যক্তিগত চেষ্টা"-র অর্থ এই যে, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) জানতেন যে, হযরত মীর সাহেব এমন একটি প্রতিষ্ঠান নিজ হাতে গড়ে তুলছেন। হযরত সাহেব এতে মীর সাহেবকে বাধা দেন নি। বরং খুশী হয়েছিলেন যে, এমন একটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যা পরবর্তীতে বিরাট আকার ধারণ করবে। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ভার বহনের জন্য সকল ব্যবস্থা হযরত মীর সাহেব নিজেই নিতেন। এই প্রতিষ্ঠানের ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও করতেন। যারা জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে চাইত তাদের জামেয়ায় ভর্তি করাতেন আর যারা হাই স্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছা করত তিনি তাদের সেখানে ভর্তি করাতেন। আল্লাহ্‌র ফযলে ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে অনেকেই মাদ্রাসা আহমদীয়া বা জামেয়া আহমদীয়া এবং হাই স্কুল পাশ করে পরবর্তীতে অনেক কিছু লাভ করেছেন। বড় বড় সম্মানজনক জীবনের অধিকারী হয়েছেন, আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং পরে বড় বড় অর্থ কুরবানী করেছেন। কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

হাকীম আব্দুল লতীফ সাহেব বর্ণনা করেছেন, 'আমি তিন বছর এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ছিলাম। আমার সময়ে অনেক যুবক শিক্ষা লাভের জন্য কাদিয়ান এসেছিল। ঐ সময় যতগুলো ছেলে এখানে ভর্তির জন্য এসেছিল, আমি যতজনকে ভর্তির জন্য হযরত মীর সাহেবের খেদমতে তাদের নাম পেশ করেছি হযরত মীর সাহেব কখনও একজনকেও ভর্তি করে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নি। যারা এখানে ভর্তি হোত তাদের সকল সমস্যার সমাধানের প্রতি হযরত মীর সাহেব নযর দিতেন। কাউকে বেকার থাকতে দেন নি। যারা পড়াশুনা করতে চেয়েছে তাদেরকে হাই স্কুল বা মাদ্রাসায় ভর্তি করাতেন। যদি কেউ দর্জির কাজ শিখতে চাইত তাকে মির্যা মাহতাব বেগ সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তিনি একজন ভাল টেইলার মাষ্টার ছিলেন। তিনি এদের প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন ও কাজ শেখাতেন।

মুন্সী মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব এক সময় দারুশ শূয়ুখের কর্মচারী ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, এখানে অবস্থানরত প্রায় ১৭৫ জনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে অনেক পরিশ্রম করতে হোত। কারণ প্রতিষ্ঠানের ফান্ডের অবস্থা খুবই দুর্বল ছিল । জামাতের কোন ফান্ড ছিল না।

একবার কাজী নুর মুহাম্মদ সাহেব দারুয যিয়াফতের হেড ক্লার্ক হযরত মীর সাহেবকে জানালেন যে, দারুশ শূয়ুখের উপর দু'হাজার টাকা ঋণ হয়ে গেছে, এখন কী করা যায়! হযরত মীর সাহেব আমাকে বুঝালেন, 'আগামীকাল বিকালে আপনি টাংগা (টমটম) নিয়ে আসবেন এবং আমার সাথে যাবেন। আমরা দারুশ শূয়ুখের চান্দা তুলতে বের হব।' [আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে আবেগ সৃষ্টি হয়েছে, এই কারণে যে, হযরত মীর সাহেব ঐ সময় অসুস্থ ছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, তাঁরা কত কষ্ট করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য।] পরের দিন বিকালে আমি টমটম নিয়ে আসলাম এবং যাত্রা করলাম। হযরত ইয়াকূব আলী এরফানী আল্ কবির মরহুমের বাড়ীর কাছে হযরত নবাব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের সাথে দেখা হয়ে গেল। হযরত নবাব আব্দুল্লাহ্ খান একজন বড় দানবীর ছিলেন। ঘটনাক্রমেই তাঁর সাথে দেখা হয়ে গেল। হযরত মীর সাহেবের সাথে করমর্দন করেই তিনি বললেন, মামুজান! আপনার তো জ্বর! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত নবাব সাহেব করমর্দন করেই বুঝলেন যে, মীর সাহেব জ্বরে আক্রান্ত। নতুবা কেউ জানতে পারেনি যে, হযরত মীর সাহেব অসুস্থ। যিনি টমটম নিয়ে এসেছিলেন তিনিও না।

হযরত মীর সাহেব বল্‌লেন, হ্যাঁ, সামান্য জ্বর আছে। কিন্তু দারুশ্ শূয়ুখের উপর কিছু ঋণের বোঝা হয়ে গেছে তাই চান্দা তুলতে দারুর রহমত যাচ্ছি। হযরত নবাব সাহেব পকেটে হাত দিয়ে পঞ্চাশ টাকা বের করে দিলেন। হযরত মীর সাহেব ঐ টাকা আমাকে দিয়ে বল্‌লেন, পকেটে রাখতে থাক।' যখন নবাব সাহেব কিছু দুরে গেলেন, মীর সাহেব বল্‌লেন, 'বওনি তো ভালই হয়ে গেল।' দোকানদাররা মনে করে যে, সকালে দোকান খোলার পরে প্রথম বিক্রি যদি লাভজনক হয় তবে সারাদিন ভাল ব্যবসা হবে। জানি না দোকানদারদের এ ধারণা কতটা সত্য। কিন্তু হযরত মীর সাহেবের যাত্রা তো শুভ হবারই ছিল, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র খাতিরে বেরিয়ে ছিলেন।

'আমরা দারুল রহমত পৌছে গেলাম'। হুযূর (আইঃ) বলেন, জানি না হযরত মীর সাহেব প্রথম দিন দারুর রহমত কেন গেলেন। হয়ত 'রহমত' নাম দেখে আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করে বেরিয়েছিলেন তাই দারুর রহমত গেলেন। মাগরেবের নামাযের পর সকলের সামনে চান্দার আবেদন করা হল। মৌলভী আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবকে বক্তৃতা করতে বল্‌লেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, জলন্ধরী সাহেবকে বক্তৃতা করতে বলা থেকে বুঝায় যে, হযরত মীর সাহেব বেশ অসুস্থ ছিলেন। নতুবা হযরত মীর সাহেব খুবই ভাল বক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা বড়ই হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী হত। তাঁর কথায় শ্রোতারা অনেক সময় চিৎকার করে কাঁদতেন। অন্যদেরও কাঁদাতেন, নিজেও কাঁদতেন। কিন্তু এদিন তাঁর বক্তৃতা না করা থেকে বুঝায় যে, মীর সাহেব বেশ অসুস্থ ছিলেন। মহল্লার অধিবাসীরা অনেক বেশী করে চাঁন্দা দিলেন। খাদ্যশস্যও দিলেন। পরের দিন আমরা দারুল ফযল গেলাম। এভাবে প্রতিদিন বিভিন্ন মহল্লায় যেতে থাকলাম। এক সপ্তাহে আড়াই হাজার জমা হয়ে গেল।

হাফেয আব্দুল আযীয, মুয়ায্‌যিন মসজিদ আকসা বর্ণনা করেছেন। একবার একবার ধনী ব্যক্তি কাদিয়ান এসেছিলেন। খুব ব্যস্ত ছিলেন। মাত্র এক ঘন্টা সময় করে হযরত আকদস (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। শীঘ্রই তিনি ফেরত যাবার ছিলেন। হযরত মীর সাহেব এমন ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন, যারা ভাল অবস্থাশালী। হযরত মীর সাহেব দ্রুত ঐ ব্যক্তির জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করলেন। ভাই আহমদ দীনের দোকান থেকে লাচ্ছি আনালেন। ঐ মেহমানকে দারুশ শূয়ুখে নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। তারপর দারুশ শূয়ুখ দেখালেন এবং এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। এতীমদের এখানে যত্ন নেয়া হয়, থাকা খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। হযরত মীর সাহেব বল্‌লেন, দেখুন, আমি এটাকে বাগানের মত করে গড়েছি ....।" হুযূর (আইঃ) বলেন, 'আমি আপনাদের বোঝাতে চাচ্ছি যে, ঐ যুগে নেকী-তাকওয়ার ভিত্তিতে যে প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি রাখা হয়েছিল আজ ঐ ভিত্তির উপরে

বিরাট বড় দালান নির্মিত হয়েছে। ঐ যুগে যে বীজ রোপন করা হয়েছিল পরে তা আর্ন্তজাতিক বাগানে পরিণত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এর বিস্তার ও প্রসার ঘটেছে।' তারপর হযরত মীর সাহেব বল্‌লেন, আল্লাহ্‌র খাতিরে এই বাগান লাগিয়েছি। আপনিও এই পুণ্যকর্মে অংশ নিতে পারেন। এ ব্যক্তি হযরত মীর সাহেবের কথায় মুগ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচ'শ টাকা দিয়েছিলেন। যদিও এযুগে এ টাকা একটি বড় অংকের টাকা ছিল কিন্তু তারপরও তা অতি সামান্য ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন এমন লোককে জানি যারা ঐ দায়শ্‌ শূয়ুখ থেকে শিক্ষা পেয়ে বড় হয়েছেন। কেউ কেউ পরে নিজ জীবনে প্রায় এক কোটি টাকাও এই প্রতিষ্ঠানের এতীমদের জন্যে ব্যয় করেছেন। ঐ প্রতিষ্ঠালব্ধ বৃক্ষ সরাসরি ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে অনেক অনেক প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। বড় বিশাল অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছেন। যারা ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ করেছেন তারা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করেছিলেন। তাদের দোয়া ও চেষ্টাকে আল্লাহ্‌ কতবড় আকারে কবুল করেছেন! আজ সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ফযলে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর বাগান শোভা পাচ্ছে। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

বাহার আয়ি হ্যায় ফের ইয়ে ওয়াক্‌তে খেযা মেঁ
লাগে হ্যা ফুল মেরে বোস্তাঁ মেঁ।
(শীতের শেষে পাতা-ঝড়ার এই মৌসুমে- এই
অসময়ে আমার বাগানে ফুল ফুটেছে)

এটা শীতকাল। পাতা ঝরে পড়ার সময়। দেখ, পৃথিবীতে সর্বত্র এতীম, বিধবা, অসহায় মানুষের খোঁজ-খবর করার কেউ নেই। আজ পাকিস্তানও জ্বলছে, আজ ইরাক জ্বলছে, বাংলাদেশ জ্বলছে, রাজনীতি-করা বড় বড় কথা বলে, বড় বড় অঙ্গীকার দেয়া হয় ভোট পাওয়ার জন্য। ভোটের জন্য সকল প্রকার লোভ দেখায়। পরে ভোট খেয়ে নেয়-ভোটারদের পেট খালি থেকে যায়। সুতরাং সমস্ত পৃথিবী অভাবগ্রস্থ। পুরো যমানা (যুগ) ফকীর হয়ে পড়েছে। এর কিছু সমাধান কর। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "চোখের অশ্রু দিয়ে, হে আমার বন্ধুরা! কিছু সমাধানতো কর।"

অন্য কিছু করা সম্ভব না হলেও চোখের পানি এই আগুনকে নিভাতে পারবে। অন্তরে এদের জন্য বেদনা বোধ কর, চোখের অশ্রু দিয়ে এদের জন্য সমাধান খুঁজে বের কর। শেখ সা'দী বলেছেন,

'এক সময় অনাবৃষ্টিতে সারা দেশ শুকিয়ে গিয়েছিল, দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সর্বত্র পানি শুকে গিয়েছিল। এতীমের চোখের পানি এখনও শুকায় নি।' তিনি খুবই চমৎকার কথা বলেছেন। আজ সকল পানি শুকিয়ে গেছে কিন্তু এতীমের চোখের পানি শুকিয়ে যায় নি। আজ সময় এসেছে, সারা পৃথিবীর সকল শুকিয়ে যায় যাক। **হে আহমদী, তোমার চোখের পানি যেন শুকিয়া না যায়। আজ কেবল তোমার চোখের পানি এই বাগানে জল- সেচন করতে পারবে। আল্লাহ্‌র রহমতে এই পানি এই আগুনকে নিভাতে পারবে।**

আমি আশা করি আল্লাহ্‌ আমার জামাতকে শক্তি দিবেন, দিচ্ছেন আরো শক্তিও সুযোগ দিবেন। দিতে থাকবেন। **আজ যদি তোমরা এই অভাবগ্রস্থ মানবমন্ডলীকে পরিত্যাগ কর, তবে আর কেউ নেই, যে মানুষের সহায় হবে। প্রত্যেক নেকী বা পুণ্যের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়িত্ব আহমদীয়া জামাতের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আল্লাহ্‌র রহমতকে সাথে নিয়ে দোয়া করতে থাক। অগ্রসর হতে থাক দোয়ার মাধ্যমে যেন চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে, যদ্বারা এই বাগানে জলসেচনের কাজ চালাতে থাক। যদ্দুর সম্ভব, বাগান যেন সদা সবুজ থাকে, এটা সৃষ্টির সেবার বাগান।**

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের যোগ্যতা যেন বাড়াতে থাকেন। এটা আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত দায়িত্ব। দু'টিই তো উদ্দেশ্য! **আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কও মানব জাতীয় সেবা। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক মানব জাতীয় সেবার সাথে শর্ত সাপেক্ষ। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক মূল উদ্দেশ্য কিন্তু ঐ সম্পর্ক আরম্ভ হয় মানবতার সেবা দিয়ে, যদি মানব জাতির সাথে সেবার সম্পর্ক না থাকে তবে আল্লাহ্‌ও করুণা বা কৃপা দৃষ্টি দেন না। আল্লাহ্‌র বান্দাদের ভালবাসতে শিখ, উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রাপ্তি। যদি বান্দাদের ভালবাস তবে আল্লাহ্‌ অবশ্যই তোমাদের ভালবাসবেন।**

আবূ বিন আদমের একটি গল্প প্রচলিত আছে। সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এমন কি ইংল্যান্ডে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে ঐ গল্পের ভিত্তিতে। ঐ গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তো এটাই যে, আবূ বিন আদম একবার হজ্জের সময় শায়িত এবং তদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কাশ্‌ফে (দিব্য-দর্শনে) দেখলেন ঃ-

'ফিরিশ্‌তারা হাতে কিতাব নিয়ে কিছু লিখছেন। আবূ বিন আদম জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি লিখছেন?' তাঁরা বল্‌লেন, 'আমরা এমন লোকদের নাম লিখছি যাঁরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন।' আবূ বিন আদম জিজ্ঞেস করলেন, দেখুন তো আমার নাম এখানে আছে কি ? কিন্তু ওখানে তার নাম পাওয়া গেল না।

আবার দেখলেন, আর একটি রেজিষ্টার লেখা হচ্ছে। আবূ বিন আদম জিজ্ঞেস করলেন, কি লেখা হচ্ছে ? ফিরিশ্‌তারা বল্‌লেন, 'আমরা তাদের নাম লিখছি যারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের ভালবাসেন।' এখানে দেখা গেল আবূ বিন আদমের নাম তালিকার শীর্ষেই আছে।

আবার দেখলেন, আর এক রেজিষ্টারে নাম লেখা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, কাদের নাম ? ফিরিশ্‌তারা বল্‌লেন, 'এখানে এমন লোকদের নাম লেখা হচ্ছে যাদেরকে আল্লাহ্‌ ভালবাসেন।' দেখা গেল এখানেও আবূ বিন আদমের নাম তালিকার শিরোভাগেই রয়েছে।'

যারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি ভালবাসা রাখেন তাদের নামের মধ্যে আবূ বিন আদমের নাম এবং আল্লাহ্‌ যাদের ভালবাসেন তাদের নামের মধ্যে আবূ বিন আদমের নাম আছে। যদিও ঐ তালিকায় এর নাম নেই যা আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন।

আল্লাহ্‌ করুন কিয়ামত পর্যন্ত যেন আহমদীদের নাম ঐ রেজিষ্টারের মধ্যে থাকে যাতে এমন লোকদের নাম আছে যাদেরকে আল্লাহ্‌ ভালবাসেন।

অনুবাদ- **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**, সদর মুরব্বী

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(অষ্টম কিস্তি)

এখন একটু চক্ষু মেলিয়া দেখা দরকার যে, এই ধরনের মাধ্যম যাহাদের কথা কুরআন শরীফে লিখা আছে তাহাদিগকে মান্য করিলে কি ধরনের শির্ক হইতে পারে, এবং খোদাতাআলার কুদরতের শানে কোন ফরক আসে কিনা। বরং ইহা তো মা'রেফতের গোপন রহস্য এবং হিকমতের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব যাহা সৃষ্টির বিধানের পাতায় পাতায় লিখা আছে বলিয়া নজরে আসে। এবং এই এস্তেজামকে মান্য করা ছাড়া খোদাতাআলার কুদরতে কামেলা (পরিপূর্ণ শক্তি) সাবেত করাই মুস্কিল। এবং তাহার খোদায়ীও চলিতে পারে না। যদি প্রতিটি পরমাণু ফিরিশ্তা হইয়া তাহার এতায়াত না করে তাহা হইলে এই কারখানা-এ-কুদরত কীভাবে চলিতে পারে কেহ আমাদিগকে একটু বুঝাইয়া দিক তো দেখি? এবং যদি আকাশের ফিরিশ্তাদের রূহানী নেযাম দ্বারা খোদাতাআলার কুদরতের শানে কোন কলংক হইতে না পারে, তাহা হইলে কেন ফিরিশ্তাদের জিসমানী নেযাম মানিয়া নিলে যাহা রূহানী নিযামেরই মত খোদাতাআলার কুদরতে কামেলার উপরে কলংকের ছাপ লাগিবে না ? বরং সত্য কথা হইল ইহাই যে, আর্য সমাজী এবং তাহাদেরই মত অন্যান্যরা যাহারা আমাদের বিরুদ্ধবাদী তাহারা শুধু তাহাদের রূহানী দৃষ্টি শক্তি না থাকার কারণে খামাখা এই ধরনের এতরাজ করিয়াছে যাহার আসল শিকড় বহু পাদটীকাসহ তাহাদের নিজের ঘরে বিদ্যমান আছে। এবং অন্যায়ভাবে নিজেদের দিব্যদৃষ্টি না থাকার কারণে একটি সুন্দর সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিয়া নিয়াছে।

(ফারসী নজম ও উহার অনুবাদ দেওয়া সম্ভব হইল না – অনুবাদক)

এই কথাও মনে রাখা উচিত যে, ইসলামী শরীয়ত অনুসারে ফিরিশ্তাদের বৈশিষ্ট্য মানবকুলের বৈশিষ্ট্য হইতে কোন কিছুতেই বেশী বা উচ্চতর নহে; বরং মানবকুলের গুণাবলী ফিরিশ্তাদের গুণাবলী হইতে উন্নততর মর্যাদা রাখে। এবং রূহানী নেযাম বা জিসমানী নেযামের মধ্যে তাহাদের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি তাহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করে না, বরং কুরআন শরীফের রূহ অনুসারে তাহাদিগকে, সেবক হিসাবে সেবা করার কাজে লাগানো হইয়াছে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন) আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ফরমাইতেছেন।

"সেই খোদা যিনি সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত করিয়াছেন" *(ইব্রাহীম রুকূ নং ৫)*।

যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এক পত্র বাহক বাদশাহের নিকট হইতে তাহার পত্র কোন প্রাদেশিক গভর্ণর বা গভর্ণর জেনারেলের নিকট পৌছাইয়া দেয় তবে কি সেই পত্র বাহক গভর্ণর জেনারেল হইতে শ্রেষ্ঠ। এইজন্য যে, সে বাদশাহ এবং গভর্ণর জেনারেলের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। সুতরাং খুব ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর যে, ইহাই ফিরিশ্তাগণের উদাহরণ যাহারা নেযামে জিসমানী এবং নেযামে রূহানীর মধ্যে আল্লাহ্র ইচ্ছাগুলিকে পূরণ করার জন্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন, সেই কাদেরে মুতলকের এরাদাগুলিকে পৃথিবীতে পৌছাইয়া থাকেন এবং ঐগুলিকে পরিপূর্ণতা দান করিতে ব্যস্ত আছেন। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কুরআন শরীফে বহু জায়গায় ফরমাইয়াছে যে, যাহা কিছু আসমান এবং জমীনে পয়দা করিয়াছেন তাহা সবই মানুষের তুফায়েলে পয়দা করিয়াছেন। অর্থাৎ শুধু মানুষের ফায়দার জন্য পয়দা করিয়াছেন এবং ইনসান স্বীয় মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবার উপরে এবং সবাই তাহার সেবায় নিয়োজিত। সে সবার মখ্দুম এবং অন্যান্যরা তাহার খাদেম এবং তিনি ফরমাইতেছেন, "এবং তিনি চালিত করিয়াছেন সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমাদের সেবার জন্য যাহারা সবদাসর্বদা চলাফেরা করিতেছে অর্থাৎ তাহারা স্বীয় ধর্মে এবং বৈশিষ্ট্যে সর্বদা এক অবস্থায় থাকে না, স্থান পরিবর্তন করে; দৃষ্টান্তস্বরূপ শীতের সময়ে সূর্যের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় গ্রীষ্মের সময়ে তাহা অবশ্যই থাকে না। সুতরাং সূর্য এবং চন্দ্র এইভাবে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে সব সময়েই ; কখনও তাহাদের প্রদক্ষিণের ফলে বসন্ত আসে আবার কখনও গ্রীষ্মকাল আসে কখনও শীতকাল আসে। এবং কোন কোন সময়ে এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং কখনও উহার বিপরীত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। তারপর ফরমাইয়াছেন রাত এবং দিনকে তোমাদের জন্য সেবায় নিয়োজিত করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে দান করিয়াছি প্রত্যেক ঐ সকল বস্তু যাহা তোমাদের প্রকৃতি চায়, অর্থাৎ তোমাদিগকে ঐ সব জিনিস দিয়াছি যাহার উপরে তোমরা নির্ভরশীল, আর যদি তোমরা খোদাতাআয়ালার নেয়ামতসমূহ গণনা করিতে চাও তাহা হইলে গণনা করিতে পারিবে না। তিনিই সেই খোদা যিনি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তোমাদের ফায়দার জন্য দৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্তাআলা আরেক আয়াতে ফরমাইতেছেন অর্থাৎ মানুষকে আমরা সুষমভাবে তৈরী করিয়াছি, এবং সে এই সুষম তৈরীর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সুন্দর। অতঃপর আর এক জায়গায় ফরমাইয়াছেন অর্থাৎ "আমাদের আমানত যাহার অর্থ এশক্ ও মহব্বতে এলাহী এবং পরীক্ষায় পড়িয়া তার পরে পরিপূর্ণ এতায়াত করা–আসমানের তামাম ফিরিশ্তা এবং পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপরে এবং পাহাড়গুলির উপরে এই আমানতের ভার বহনের জন্য দায়িত্ব দিয়াছিলাম যাহারা বাহ্যতঃ বড়ই শক্তিশালী এবং বিশালবপু মনে হয়–কিন্তু তাহারা সবাই এই আমানতের ভার-বহন করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহার আযমতকে (বিশালত্বকে) দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে; কিন্তু মানুষ ইহাকে উঠাইয়া নিয়াছে–কেননা, মানুষের মধ্যে দুইটি গুণ আছে (১) প্রথমতঃ সে খোদাতাআলার রাস্তায় নিজের নফসের উপরে যুলুম করিতে পারে (২) দ্বিতীয়তঃ খোদাতাআলার মহব্বতে ঐ দরজা পর্যন্ত পৌছিতে পারে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর সবকিছুকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে পারে (চলবে)।

অনুবাদ– **ওবায়দুর রহমান ভুইয়া**

জুমুআর খুতবা

ওয়াকেফীনদের নব প্রজন্মের প্রস্তুতির ব্যাপারে কিছু উপদেশ

[সাইয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯, হল্যান্ড]

তা শাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পরে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আমি হল্যান্ড থেকে যে খুতবা দিচ্ছি তা আসলে আমার গত খুতবার পরিশিষ্ট বিশেষ। এ খুতবার কথা-বার্তা আমি ধীরে ধীরে বলবো। কেননা, এ খুতবা একই সাথে ডাচ ভাষার অনুবাদ করা হচ্ছে। যতটুকু আমার বিগত দিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাথেকে আমি বলতে পারি যে, ডাচ্ ভাষায় অনুবাদকারী ইংরেজীতে তো খুবই ভাল এবং সরাসরি সরল অনুবাদ করে থাকেন কিন্তু ডাচ্ ভাষায় পান্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষিপ্রতার সাথে সরাসরি অনুবাদ করার সামর্থ্য এখন পর্যন্ত আমাদের মুবাল্লিগদের মধ্যে নেই অর্থাৎ উর্দূ থেকে সরাসরি (ডাচ ভাষায়) অনুবাদ করার। এজন্যে বাক্যও ছোট বলতে হবে যেন বিষয়-বস্তুর কোন অংশ বাদ পড়ে না যায়। আমি বিগত খুতবায় ওয়াকেফীনে নওদের নব প্রজন্মের প্রস্তুতির প্রসঙ্গে কিছু উপদেশ দিয়েছিলাম অর্থাৎ ওয়াকেফীনদের বর্তমান প্রজন্মের প্রস্তুতির ব্যাপারে, যাদেরকে আগামী শতাব্দীতে উপঢৌকন হিসেবে আহমদী জামাতের পক্ষ থেকে খোদার হুযূরে উপস্থাপন করা যাচ্ছে। যেহেতু এ বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বিগত খুতবায় বর্ণনা করা যায় নি, কতক অংশ রয়ে গিয়েছিলো এবং কতক আরও ব্যাখার মুখাপেক্ষী ছিলো এজন্যে আজ সংক্ষেপে আমি এ বিষয়-বস্তু বর্ণনা করবো। **ওয়াকেফীনদের গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন**–ঐ ওয়াকেফীন যারা ব্যাধির শিকার হয়ে থাকে, যদিও তাদের মধ্যে কতক খোদাতাআলা প্রদত্ত সৌভাগ্যের কারণে অসাধারণ সেবাও উপস্থাপন করতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান ওয়াকেফীন রোগগ্রস্ত ওয়াকেফীনের তুলনায় অধিক সেবা করার যোগ্য প্রমাণিত হয়ে থাকে। **এজন্যে বাল্যকাল থেকেই তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি খুব সাবধানতার সাথে দৃষ্টি রাখা জরুরী**। আবার তাদেরকে বিভিন্ন খেলা-ধূলায় সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে রীতিমত চেষ্টা করা উচিত। খেলাধূলার ব্যাপারে এক এক ব্যক্তির পসন্দ এক এক রকম হয়ে থাকে। সুতরাং যে খেলার প্রতি যে ওয়াকফে নও শিশুর অনুরক্তি দেখা যায় ঐ খেলায় আশানুরূপ সফলতার জন্যে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে তাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। কখনও এমন এক মুরব্বী যিনি কোন খেলায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে থাকেন, কেবল এ খেলার সুবাদে তিনি লোকদের ওপরে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপ্রত্তি সৃষ্টি করে নেন। আর যুব-সম্প্রদায় তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের তরবীয়ত ও প্রশিক্ষণের যে কোন পথ অবলম্বন করা দরকার। কেননা, আমাদের নিয়্যত নিষ্ঠাপূর্ণ। এজন্যে এ রাস্তা খোদার দিকেই যাবে। পার্থিব জ্ঞানের ব্যাপারে আমি বলেছিলাম যে, তাদের শিক্ষার পরিধি ব্যাপকতর করা দরকার। তাদের জ্ঞানের পরিধিও ব্যাপকতর করা দরকার। এ প্রসঙ্গে জাতির ইতিহাস, ও বিভিন্ন দেশের ভূগোল বিশেষভাবে তাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে শিশুর শৈশবের স্বভাবগত ঝোঁককে অবশ্যই দৃষ্টি-পটে রাখা দরকার। আর শিক্ষার ব্যাপারে এমন গাম্ভীর্য অবলম্বন করা উচিত নয় যদ্বারা ঐ শিশু হয় একেবারেই শিক্ষার প্রতি উদাসীন হয়ে যায় বা অন্যান্য শিশু থেকে নিজেকে একেবারেই অন্য কিছু মনে করে বসে এবং অন্যান্য শিশুর সাথে তার স্বভাবগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন, শিশুরা কিস্সা-কাহিনীও পসন্দ করে। এক বয়সে পৌঁছে তাদেরকে উপন্যাস পাঠ করা থেকে দূরে রাখা উচিত নয়। কিন্তু কতক ধরনের কাহিনী যা কিনা মানবীয় স্বভাবের ওপরে নোংরা ও গভীর খারাপ প্রভাবসমূহ ফেলে যায়, এথেকে তাদেরকে রক্ষা করা উচিত। হোক না দৃষ্টান্তস্বরূপ এক আধটি কাহিনী তাদের পড়তেও দেয়া উচিত। কতক শিশু Detective stories অর্থাৎ গোয়েন্দা কাহিনীতে খুবই স্বাদ পেয়ে থাকে। কিন্তু যদি তাদের এ ধরনের অযথা গোয়েন্দা কাহিনী পাঠ করানো হয় – যেভাবে আজকাল পাকিস্তানে খুবই প্রচলিত রয়েছে এবং কতক লেখক শিশুদের মধ্যে অসাধারণ সুনাম অর্জন করেছে । গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক হিসেবে তো তাদের মেধা প্রখর হয়, তাদের যুক্তি প্রদানের শক্তিসমূহ তীক্ষ্ণ হয়ে যায় এবং পূর্বের চেয়ে অধিক যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা তাদের তেজদীপ্ত হয়, এতদ্ব্যতিরেকে তারা এমন মূর্খতাপূর্ণ গোয়েন্দা চিন্তা-ভাবনায় জড়িয়ে পড়ে যে, এর ফলশ্রুতিতে বুদ্ধি-ভ্রষ্ট করা ব্যতিরেকে আর কিছু সাধিত হতে পারে না। সারা বিশ্বে শার্লক হোমসের যে অসাধারণ খ্যাতি লাভ হয়েছে তিনিও তো গোয়েন্দাগীরি নভেল লেখক ছিলেন। কিন্তু তার গোয়েন্দা কাহিনীসমূহ বিশ্বে এতগুলো ভাষায় অনূদিত হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত অন্য কোন লেখকের এ ধরনের কাহিনী অন্য ভাষায় এভাবে অনুবাদ করা হয় নি। যেভাবে সেক্সপিয়ারের নাম নিয়ে ইংরেজ জাতি গর্ব করে থাকে তেমনিভাবে এ গোয়েন্দা কাহিনীর লেখককে নিয়েও ইংরেজ জাতি গর্ব করে থাকে। ইহা এজন্যে যে, তার যুক্তি-প্রমাণে যথার্থতা ছিলো, যদিও কাহিনী ছিলো অলীক। এজন্যে এধরনের গোয়েন্দা কাহিনী শিশুদেরকে অবশ্যই পড়ানো উচিত, যদ্বারা যুক্তি-প্রমাণ দেয়ার শক্তিসমূহ প্রখর হয় কিন্তু মূর্খতাপূর্ণ গোয়েন্দা কাহিনীগুলো তো যুক্তি-প্রমাণ দানের শক্তিসমূহকে পূর্বের চেয়ে প্রখর করার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এভাবে হিন্দুস্থানে ও পাকিস্তানে আজকাল এক রীতি খুবই প্রচলিত আছে। আর উহা হলো শিশুদের দৈত্য-দানার কাহিনী পাঠ করানোর রীতি। হিন্দুস্তানের দৈত্য-দানার কাহিনীগুলোতে এমন ধরনের চিন্তাধারা অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় যা কিনা শিশুদের ভূত ও যাদু-বিদ্যায় বিশ্বাস করায়। এ ধরনের চিন্তাধারা তাদের মনের মধ্যে খচিত হয়ে যায়। যেমন সাপ, এক বয়স পর্যন্ত গিয়ে এমন যোগ্যতা অর্জন করে যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি জন্তুর রূপ ধারণ করে আর এভাবে যাদুগীর ও ডাইনীরূপে মানব জীবনের উপরে এক গভীর কর্মকান্ড চালিয়ে যায়। এসব অলক কাহিনী যদি বড়ড়া পড়ে তাহলে অবহিত হতে পারে যে, এসব কেবল ছেলে-ভুলানো মনগড়া কাহিনী কিন্তু

যখন শিশু পড়তে থাকে তখন সব সময়ের জন্যে তার মনে নানা প্রকার প্রভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। শিশু একবার এসব কাহিনীর ডর পোকা বা ভীতুর ঢেলা হয়ে যায় এবং অন্ধকারকেও ভয় পায়, ঐসব বস্তু থেকেও ভয় পায়। পরে সারা জীবন তার এ দুর্বলতা দূরীভূত করা যেতে পারে না। কতক লোক শৈশবের ভীতি নিজের বুড়ো বয়স পর্যন্ত বহন করে থাকে। এজন্যে কাহিনীর মধ্যেও এমন সব কাহিনীকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক যদ্বারা কর্ম-নৈপুণ্যে মাহাত্ম্য, সত্যপ্রিয়তা ও সাহসিকতা সৃষ্টি হয়। অন্যান্য মানবীয় চরিত্রের মধ্য থেকে কতিপয় সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে–এমন সব কাহিনী তা পশুর ভাষায়ই বর্ণনা করা হোক না কেন, ক্ষতির বদলে কল্যাণপ্রদই হবে। আরবী ভাষার কাহিনী লেখকদের মধ্যে এ অনুরাগ দেখা যায় যে, তারা পশুর কাহিনীর আকারে অনেক চারিত্রিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। আলিফ লায়লা নামে দুনিয়ার বিখ্যাত যে কাহিনী রয়েছে, এতে যদিও নোংরা কাহিনীও রয়েছে, তবুও এগুলোর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় ইহাই যে, বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে কতক মানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলীকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, এক গল্প আছে যে, **এক বাদশাহ্ স্বীয় রানীকে এক স্থানে একটি কুকুরের মত বেঁধে রেখেছিলেন। তার সাথে পশুর ন্যায় আচরণ করা হতো। কুকুরকে খুবই সম্মানের সাথে সম্ভ্রান্ত মানুষের ন্যায় মহলের মধ্যে বসানো হয়েছিলো এবং উহার সেবার জন্যে চাকর-বাকর নিযুক্ত ছিলো।** এ গল্প বাহ্যিকভাবে একেবারেই অলীক। **কিন্তু যে উন্নত চরিত্রের কথা বলার উদ্দেশ্যে ছিলো তা হলো এই যে, কুকুর মালিকের বিশ্বস্ত ছিলো আর রানী ছিলো শঠ ও অকৃতজ্ঞ।** সুতরাং এ গল্প পড়ে শিশু কখনও এ শিক্ষা গ্রহণ করবে না যে, স্ত্রীর ওপরে নির্যাতন চালাতে হবে। বরং ইহা শিখবে যে, মানুষকে বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হতে হবে। এভাবেই মাওলানা রুমীর মসনবীতে কতিপয় গল্প এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পাঠ করে কতক লোক বুঝতেই পারে না যে, ইনি কেমন মাওলানা যিনি এত নোংরা গল্প স্বীয় মসনবীর মধ্যে লিখেছেন। এগুলো পাঠ করে মানুষ মনে করে যে, তার সকল দৃষ্টি যৌন বিষয়াবলীর প্রতি নিবদ্ধ। এর বাইরে তিনি চিন্তাই করতে পারেন না। সুতরাং একবার লাহোরে একজন সম্মানিত গয়ের আহমদী রাজনীতিবিদ আমাকে মাওলানা রুমীর মসনবী দেখালেন যার মধ্যে স্থানে স্থানে চিহ্নিত করা ছিলো এবং সাথে সাথে একথা বল্লেন, আপনারা তো বলেন যে, ইঁনি বুযর্গ মানুষ। তাঁর এত বড় মর্যাদা ছিলো। এত বিরাট দার্শনিক ছিলেন। এমন একজন সূফী ছিলেন। কিন্তু এসব ঘটনা আপনি পাঠ করুন আর আমাকে বলুন যে, কোন ভদ্র ব্যক্তি ইহা কি সহ্য করবে যে, তার স্ত্রী-কন্যা পুত্র-বধু এসব গল্প পাঠ করুক ? তাই আমি যখন এসব অংশগুলো বিশেষভাবে পাঠ করলাম তখন মনে হলো, এ বন্ধু মন্তব্য করতে ভুল করেছিলেন। এসব কাহিনী যদিও যৌন বিজ্ঞানের সাথেই সম্পর্কিত কিন্তু উহার চূড়ান্ত ফলাফল এরূপ ছিলো যে, মানুষকে যৌন বিষয়ে বিপথগামিতার প্রতি কঠোর অনীহা সৃষ্টি করে দিতো এবং পরিণাম এমন ছিলো যদ্বারা যৌন আবেগ উছলিয়ে ওঠার পরিবর্তে মানুষের মন পবিত্রতার দিকে ঝুঁকে পড়তো। অতএব এখন বিস্তারিতভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা আমার উদ্দেশ্যে নয়। কতিপয় উদাহরণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। **আপনাদের শিশুকে আপনার যা কিছু পড়িয়ে থাকেন সে সম্বন্ধে ভালভাবে সতর্ক থাকুন যে, বাল্যকালে ত্রুটিপূর্ণ সাহিত্য পাঠ করালে উহার কুপ্রভাব কখনও মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সাথে আকঁড়ে থাকে এবং যদি সুসাহিত্যাদি পাঠ করানো হয় তাহলে উহার সুপ্রভাবও খুবই মর্যাদার সাথে সুফল বয়ে নিয়ে আসে আর কতক লোকের জীবন সুষমামন্ডিত করে দিয়ে থাকে।**

ভাষাসমূহের সাথে যতটা সম্পর্ক প্রাথমিক কাল থেকে আরবী ভাষার ওপরে সর্বাধিক জোর দেয়া উচিত। কেননা, একজন মুবাল্লিগ আরবীর গভীর জ্ঞান ব্যতিরেকে এবং উহার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তাৎপর্যসমূহ উপলব্ধি করা ব্যতিরেকে কুরআন করীম ও নবী (সঃ)-এর হাদীসগুলো থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হতে পারে না। এজন্যে বাল্যকাল থেকেই আরবী ভাষার জন্যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। আর যেখানে উপকরণাদি সহজলভ্য সেখানে নিত্য দিনের কথা-বার্তারও প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। কাদিয়ান ও রাবওয়াতে আমাদের ছাত্রাবস্থায় যদিও আমরা আরবী ভাষার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলাম কিন্তু দৈনন্দিন কথা-বার্তার ভঙ্গি শিখানো হয় নি অর্থাৎ মনোযোগের সাথে শিখানো হয়নি-এজন্যে উহারও একটি ক্ষতি পরে দৃশ্যমান হয়েছে। আজকাল যে রীতি অর্থাৎ কথোপকথন শিখানো হচ্ছে, কিন্তু ভাষার গভীর অর্থের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া হচ্ছে না। এজন্যে অনেক আরববাসী এমন আছে এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে আরবী শিক্ষার্থীও এমন যারা বলা তো শিখে নিয়েছে কিন্তু আরবীর গভীরতা থেকে অজ্ঞ ও উহার ব্যাকরণের ওপরে তাদের দখল নেই। সুতরাং নিজেদের ওয়াকেফীন প্রজন্মকে এ দু'টো বিষয়েই সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা দিন। **আরবীর পরে উর্দূ ভাষাও খুবই গুরুত্ব বহন করে। কেননা, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ দাসত্বে এ যুগের যে ইমাম নির্বাচিত করা হয়েছে তাঁর অধিকাংশ সাহিত্য উর্দূ ভাষায় রচিত। আহমদীয়া সাহিত্য যেহেতু বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা তাই আরব শিক্ষার্থীরাও যখন তাঁর (আঃ) আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করে তখন আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায় যে, কুরআন এবং হাদীসে এমন গভীর তত্ত্ব-জ্ঞান ঐসব লোক লাভ করে থাকে যা তাদের ধ্যান-ধারণায়ও আসতে পারে না, যদিও তারা মাতৃভাষা হিসেবে আরবী ভাষা শিখে এবং বলে।** সুতরাং আমাদের আরবী সাময়িকী আত্ তাকওয়াতে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যেসব উদ্ধৃতি ছাপা হয় ওগুলো পাঠ করে কতক গয়ের আহমদী আরবী আলেমের এমন মর্যাদাপূর্ণ সুন্দর চিঠি-পত্র আসে যে, মানুষ বিস্মিত হয়ে যায়। তাদের কতক মুফতীদের পুত্রদের অন্তর্ভুক্ত। এমন মহান ব্যক্তিদের পুত্ররা যারা ধর্মের পন্ডিত ছিলেন, তারা ধর্মে জগতে প্রসিদ্ধ মুফতী। তাদের নাম বলা সমীচীন মনে করি না। কিন্তু তারা আমাকে পত্র লিখেছে যে, আমরা তো ইহা দেখে বিস্মিত হয়েছি, আর কতক আরব বলেছে যে, এমন সুন্দর ভাষা এমন হৃদয়গ্রাহী আরবী ভাষা হযরত মসীহ্ মাওউদ-এর! এক ব্যক্তি বলেছেন, আমি আরবী সাহিত্যে খুবই উৎসাহ বোধ করে থাকি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কোন আরবকে এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ভাষা লিখতে দেখি নি। সুতরাং **আরবীর সাথে সাথে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উর্দূ সাহিত্য পাঠ করানোও আবশ্যকীয় আর শিশুদের এমন উন্নত মানের উর্দূ শিখানো আবশ্যক যেন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উর্দূ সাহিত্য থেকে সরাসরি উপকৃত হতে শিখে।** পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সাথে যতটা সম্পর্ক খোদাতাআলার ফযলে এখন বিশ্বের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দেশে এমন আহমদী প্রজন্ম তৈরী হচ্ছে যারা স্থানীয় ভাষায় খুবই পারদর্শী। ঐ ভাষা-ভাষী লোকদের ন্যায় বলে আর এখানে হল্যান্ডে এমন শিশুর অভাব নেই যারা বাইরে থেকে আসা সত্ত্বেও হল্যান্ডের ভাষা হল্যাণ্ডের ভাষা-ভাষীর ন্যায় খুবই সহজে ও স্বচ্ছতার সাথে বলে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের উর্দূ

ভাষার মান এত উচ্চে নয়। সুতরাং কতক শিশুকে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন জানতে পারলাম যে, হল্যান্ডের ভাষায়তো খুবই উন্নতি করেছে ; কিন্তু উর্দূ ভাষা শিক্ষার প্রতি তেমন বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয় নি অর্থাৎ ও ভাষায় তাদের দখল নেই। সুতরাং **ভবিষ্যতে নিজেদের ওয়াকেফীন প্রজন্মকে কমপক্ষে ৩টি ভাষায় পারদর্শী করতে হবে। আরবী, উর্দূ এবং স্থানীয় ভাষা**। তাহলে পরে ইনশাআল্লাহ্ আগামী শতাব্দীর জন্যে অধিকাংশ দেশে আহমদীয়ত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করার জন্যে খুব ভাল ভাল মুবাল্লিগ সরবরাহ করা হবে। ভবিষ্যতে জামাতী প্রয়োজন হলো কতক মানবীয় শিষ্টাচারের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনাদি, যেসব ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি আর এখন এগুলোর ওপরে পুনরায় জোর দিতে চাচ্ছি। অতএব **ওয়াকেফীন শিশুদের সদাচরণের প্রতি সুবিশেষ দৃষ্টি প্রদান আবশ্যক। তাদেরকে সদাচরণের অধিকারী বানানো দরকার**। 'আখলাক' শব্দের একটি দিক যা অধিক গভীরতার সাথে মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে কয়েকবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা কিনা সাধারণ অর্থে মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকার যোগ্যতাকে বলা হয়ে থাকে। এতদ্দ্বারা শত্রু কম হয়ে থাকে আর বন্ধু বেশী হয়ে থাকে। **কোন কর্কশ-ভাষী মানুষ উত্তম জীবন উৎসর্গকারীতে পরিণত হতে পারে না। আর কোন নিরস লোককে মোল্লা তো বলা যেতে পারে কিন্তু সে সঠিক অর্থে আধ্যাত্মিক মানুষে পরিণত হতে পারে না**। একবার একজন জীবন উৎসর্গকারীর ব্যাপারে এক স্থান থেকে অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, সে সদাচরণের অধিকারী নয় এবং লোকদের সাথে অভদ্র আচরণ করে থাকে। যখন আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি তখন সে এই উত্তর দিয়েছে যে, সব মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। আমি তো একেবারেই সঠিক ভাবেই আছি-ভালভাবে চলছি। তাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি রয়েছে। যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করি তখন তারা রাগান্বিত হয়। আমি তখন তাকে বল্লাম, দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে তো সবচে' অধিক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যতটা দূরত্ব ঐ সময়ের লোকের সাথে তাঁর (সঃ) ছিলো উহার হাজার ভাগের একভাগও জামাতে আহমদীয়ার যুবকগণের সাথে আপনার নেই। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণরূপে নিষ্পাপ ছিলেন আর আপনারা নিজেদের ভিতরে কিছু দোষ-ত্রুটি স্বয়ং বহন করেন। হুযূর (সঃ) যাদের উদ্দেশ্যে বলতেন তারা সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটিতে নিমজ্জিত ছিলো কিন্তু এসব যুবক তো কতক দিক থেকে বিবেকবান এবং বাইরের দুনিয়ার যুবকদের থেকে শত গুণে শ্রেয়ঃ। আপনি যখন উপদেশ দেন তখন তারা মন্দ বলে এবং ঘৃণাপরায়ণ হয়ে থাকে এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন উপদেশ দিতেন তখন তারা তাঁর (সঃ) প্রেমিকে পরিণত হয়ে যেতো। দ্বিতীয়তঃ আমি তাকে বল্লাম যে, এক আধটা অভিযোগ তো প্রত্যেক মুবাল্লিগের ব্যাপারেই হয়ে থাকে, যারা কোন কাজের জন্যে আদিষ্ট তাদের ব্যাপারেও এসে থাকে। প্রত্যেক লোককে তারা সন্তুষ্ট করতে পারে না। কিছু লোক অবশ্যই অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এক ব্যক্তির ওপরে যদি আপত্তির ঢের পড়ে যায় তাহলে পরে গালিবের এ পঙক্তি প্রয়োজ্য হয় ঃ

সখ্তি সহী কালাম মেঁ লেকিন না ইস কদর
কী জিস সে বাত উসনে শেকায়াত যরূর কী

সত্য কথায় কর্কশতা থাকতে পারে কিন্তু অতটা নয়। কিন্তু যার সাথে কথা বলা হয় সে-ই নালিশ করে।

সুতরাং নিজেদের সন্তানদেরকে এ অর্থে সদাচারী করে গড়ে তুলুন যেন মিষ্টি কথা বলতে পারে। লোকদের মন ভালবাসা দ্বারা জয় করে নেয়। অপরিচিত ও শত্রুদের মনেও স্থান করে নিতে পারে। উন্নত সমাজে অনুপ্রবেশ করতে পারে। কেননা, এতদ্ব্যতিরেকে তরবীয়তও হতে পারে না আর তবলীগও অসম্ভব। কতক মুবাল্লিগকে আল্লাহ্তাআলা এই যোগ্যতা দিয়েছেন। এজন্যে স্বীয় দেশের বড় বড় লোকদের সাথে যখন তারা সাক্ষাৎ করে তখন অল্প সময়ের সাক্ষাতে তারা তাদের আপন লোকে পরিণত হয়ে যায়। আর এর ফলশ্রুতিতে খোদাতাআলার আশিসক্রমে তবলীগের মহান অর্গল উন্মোচিত হয়।

বালিকাদের সাথে যতটা সম্পর্ক এ প্রসঙ্গে পিতা-মাতা অনেক বার প্রশ্ন করে থাকেন যে, আমরা তাদেরকে কেমন করে গড়বো ? পুরুষদের বেলায় বা বালকদের বেলায় যা প্রযোজ্য তার সব কথা বলে দিয়েছি। ওগুলো এদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকেও তাদের ঘর-গেরস্তির উন্নত শিক্ষা দেয়া আবশ্যক। তাদেরকে গার্হস্থ্য অর্থনীতি সম্বন্ধেও শিক্ষা দেয়া আব্যশক। কেননা, সেদিন বেশী দূরে নয় যে, ঐ ওয়াকেফীন বালিকারা ওয়াকেফীনদের সাথে বিয়ে-সাদীও করবে। যখন আমি বলি যে, সেদিন দূরে নয় এর অর্থ এই নয় যে, আপনার **অন্তরের বাসনা এই যে, এটাই হওয়া উচিত যে, ওয়াকেফীন বালিকাদের সাথে ওয়াকেফীনদেরই বিয়ে-সাদী হবে নচেৎ অন্যদের সাথে তাদের জীবন কাটানো কষ্টদায়ক হবে** এবং স্বভাবে কখনও এমন দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। একটি ওয়াক্ফে জিন্দেগী বালিকার তার গয়ের ওয়াকফ (অউৎসর্গীকৃত) স্বামীর সাথে ধর্মের ব্যাপারে ছেলের কম আসক্তি থাকায় কষ্টে-সৃষ্টে জীবন কাটাতে হতে পারে এবং ওয়াকেফীনের সাথে বিয়ের ফলশ্রুতিতে অন্য কতক সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে। যদি সে বড় লোকের মেয়ে হয় আর তার লালন-পালন সম্ভ্রান্ত কায়দায় হয়ে থাকে আর উন্নতমানের জীবন যাপন পরিচালনাকারী হয়ে থাকে তখন প্রথম থেকেই মানসিকভাবে তাকে প্রস্তুত করা হয় যেন সে সাদা-সিদা, নিরস জীবন ও দুঃখ-কষ্টের জীবন সহ্য করতে পারে এবং এই আচরণ পদ্ধতি শিখানো হয় যে, স্বল্পেও মানুষ তুষ্ট হতে পারে এবং স্বল্পেও স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ জীবন কাটাতে পারে। অতএব এসব বালিকা যাদের বাল্যকাল থেকে চাহিদার বাড়াবাড়ির অভ্যেস হয়ে থাকে সে যখন ওয়াকফে জীন্দেগীর ছুরে যায় তখন তাদের জন্যেও দোযখ সৃষ্টি করে এবং নিজের জন্যেও। চাহিদার মধ্যে স্বভাবতঃ কোন ত্রুটি নেই কিন্তু যদি চাহিদা সামর্থ্যের বাইরে হয় তাহলে পরে হোক তা স্বামীর নিকট বা পিতা-মাতার নিকট অথবা বন্ধু-বান্ধবের নিকট সেক্ষেত্রে জীবনকে দুর্বিসহ করে দেয়। আল্লাহ্তাআলা এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে কতই না সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, **লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উস'আহা** – খোদা কারও সামর্থ্যের বাইরে দাবী পেশ করেন না-তাই বান্দাগণের কি অধিকার যে, সামর্থ্যের বাইরে দাবী করে বা চাহিদা পেশ করে ? **ওয়াকেফীনে জিন্দেগী পুরুষদের স্ত্রীদের জন্যে বা ওয়াকেফীনে জিন্দেগী কন্যাদের জন্যে ইহা আবশ্যক যে, এ রীতি শিক্ষা করে। কারও নিকট তার সাধ্যাতীত চাহিদা পেশ না করে এবং স্বল্পে তুষ্ট হয়ে কম পেয়েও সন্তুষ্ট থাকা শিক্ষা করে**। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলতে চাই যে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ওয়াকেফীনদের তাহরীক করতে গিয়ে আরও একটি তাহরীক করেছিলেন যে, ধনী ঘরের শিশুদের জন্যে ঘরের অন্যান্য সব ব্যক্তিবর্গের এ কুরবানী করা উচিত, তার ওয়াকফের কারণে তার জন্যে বিশেষভাবে কিছু আর্থিক সুবিধাদির যোগান দেয় আর ইহা মনে করে যে, আমরা আর্থিক দিক থেকে

তাকে যতটা অভাবমুক্ত করে দেবো ততই উত্তম রঙ্গে সে জাতির প্রতি দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে আদায় করতে পারবে। উপদেশের সম্পর্ক কেবল ধনী ঘরের জন্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং দরিদ্র ঘরের প্রতিও প্রযোজ্য। প্রত্যেক ওয়াকফে জিন্দেগী ঘরকে অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরে যাতে ওয়াকফে জিন্দেগী রয়েছে আজ থেকেই এই সিদ্ধান্ত করে নেয়া উচিত যে, খোদা আমাদের যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন আমরা ওয়াকফে জিন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত লোককে এথেকে নিম্ন মানে থাকতে দেবো না। অর্থাৎ জামাতের পক্ষ থেকে চাহিদা পেশ করার আগেই ভাই ও বোন বা মা-বাবা যদি জীবিত হন এবং সামর্থ্য রাখেন বা অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ মিলে এমন ব্যবস্থা নেন যেন ওয়াকফে জিন্দেগী শিশুর জীবনের মান নিজের ঘরের পরিবেশ থেকে নিম্নতর না থাকে। সুতরাং এমন সব শিশু যখন জীবন সংগ্রামে অংশ নেয় তখন কোন প্রকার Inferiority Complex (হিনমন্যতা)-এর শিকার না হয় এবং আমানত ও বিশ্বস্ততার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। যতটা বালিকাদের শিক্ষার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদেরকে বিশেষ সাবধাণতার সাথে শিক্ষা দেয়া আবশ্যক অর্থাৎ Education-এর Instruction (Bachelor Degree in Education) সম্ভবতঃ বলা হয়ে থাকে বা উহার নাম যা-ই হোক না কেন দাবী এই যে, তাদেরকে শিক্ষিকা বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়াও। তারা শিক্ষকতার পেশা হয় গ্রহণ করুক বা না করুক, তাদের জন্যে ইহা কল্যাণজনক হতে পারে। এমনিভাবে লেডি ডাক্তারের ভূমিকা জামাতে অনেক বেশী রয়েছে। আবার কম্পিউটার স্পেশালিষ্টের প্রয়োজন। পুনরায় টাইপিষ্টের প্রয়োজন। আর মেয়েরা এসব কাজ পুরুষদের সাথে মেলা-মেশা ব্যতিরেকে সাধন করতে পারে। কেবল ডাক্তারদের কথা স্বতন্ত্র। বাকী সকল কাজ ভালভাবে সাধন করতে পারে। আবার তাদেরকে ভাষাবিদও বানানো উচিত অর্থাৎ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, তাদেরকে শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত করে গড়ে তোলা উচিত যেন এ জামাতের পুস্তকাদি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা সেবা প্রদান করতে পারে। এভাবে আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যত ওয়াকেফীন প্রজন্মকে পৃষ্ঠপোষণ করি তাদের প্রতিপালন করি তাদের উত্তম ওয়াকেফ করে গড়ে তুলতে জামাতিভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে মিলে মিশে চেষ্টা করি তাহলে আমি আশা করি, আগামী শতাব্দীর ওপরে জামাতে আহমদীয়ার বর্তমান শতাব্দীর প্রজন্মের এমন একটি অনুগ্রহ হবে যে, তারা ইহাকে সর্বদা কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় ও দোয়ার সাথে স্মরণ করবে। শেষে ইহা বলা আবশ্যক মনে করি যে, প্রশিক্ষণের সময়ে সবচে' অধিক জোর দোয়ার প্রতি দেয়া কর্তব্য। অর্থাৎ এসব শিশুদের জন্যে সর্বদা দরদের সাথে দোয়া করা, এসব শিশুদেরকে দোয়া করতে শিখানো এবং দোয়া করার প্রশিক্ষণ দেয়া যেন শৈশব কাল থেকেই এরা স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের সাথে একটি গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করে নেয় এবং এ সম্পর্কের ফল ভোগ করতে আরম্ভ করে। সুতরাং দোয়ার মাধ্যমে নিজের প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহগুলোকে প্রত্যক্ষ করতে লেগে যায়। তারা বাল্যকাল থেকেই এমন একটি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অর্জন করে নেয় যার মুরব্বী সর্বদা খোদাই হয়ে থাকেন এবং দিনের পর দিন তার মধ্যে ঐ পবিত্রতা সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় যা কিনা খোদার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক ব্যতিরেকে সৃষ্টি হতে পারে না। দুনিয়ার কোন শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ঐ অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও সূচিতা মানুষকে দান করতে পারে না যা কিনা খোদাতাআলার তত্ত্ব-জ্ঞান ও তাঁর স্নেহ ও তাঁর ভালবাসার ফলশ্রুতিতে সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং এসব শিশুদের তরবীয়ত ও প্রশিক্ষণে খুব বেশী দোয়ার মাধ্যমে কাজ নিন। স্বয়ং তাদের জন্যে দোয়া করুন এবং তাদেরকে দোয়াকারী শিশুতে পরিণত করুন। আমি আশা রাখি যে, এসব পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা জামাতের নিকট অর্পণ করার পূর্বেই এসব শিশু সর্বপ্রকার সৌন্দর্যে মন্ডিত হয়ে থাকবে আর এমন পিতা-মাতা খুবই খুশীতে ভরপুর হয়ে এবং পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে এমন একটি কুরবানী খোদার সমক্ষে উপস্থাপন করে থাকবে যাকে তারা তাদের সামর্থ্যানুযায়ী সুসজ্জিত করে এবং গড়ে তুলে খোদার সকাশে উপস্থাপন করে থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এসব উত্তম চাহিদাগুলোকে পূরো করার সৌভাগ্য দান করুন। তথাস্তু (ওয়াকফে নও বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'তাহরীকে ওয়াকফে নও' পুস্তক থেকে)

অনুবাদ – মুহাম্মদ মুতিউর রহমান

ওয়াকফে নও মুজাহিদের সাথে পরিচিত হোন

নাম : কায়সারা সোহেল [নং ৪৫৩১ (বি)]

পিতা : সোহেল সাত্তার স্বপন

মাতা : কামরুন্নেসা সোহেল

দাদা : মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

(মাদারটেক, ঢাকা)

নানা : মোহাম্মদ হোসেন

কারবালার ঘটনার সংক্ষিপ্ত পটভূমি

আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা

মুহাম্মদ ইউসুফ আনোয়ার
শিক্ষক, মাদ্রাসা আহমদীয়া, কাদিয়ান

হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ) চতুর্থ হিজরীর ৩/৪ শাবান তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর নাম রাখেন হুসায়েন এবং আকীকা দেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জনাব ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। তিরমিযী হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর (রাঃ) বরাতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন যে, হাসান ও হুসায়েন বেহেশ্‌তের যুবকদের নেতা। আবার তিরমিযী উসামাহ্ বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যে, এরা উভয়েই আমার পুত্র এবং আমার কন্যারও পুত্র। হে খোদা! তারা আমার বন্ধু, তুমিও তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখো এবং তাদেরকেও যারা তাদের বন্ধু মনে করে। তিরমিযীতে আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আহলে বায়তের কার সাথে আপনার অধিক ভালবাসা রয়েছে। তিনি (সঃ) বলেন, হাসান (রাঃ) এবং হুসায়ন (রাঃ)-এর সাথে এবং তিনি ফাতেমা (আঃ)-কে বলেছিলেন, আমার উভয় পুত্রকেই নিয়ে এসো । তিনি (সঃ) তাদের উভয়ের গায়ের গন্ধ নিতেন এবং বুকের সাথে জাপ্‌টে ধরতেন। হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সঃ) বলেছেন যে, হুসায়েন (রাঃ) আমা থেকে আর আমি হুসায়েন (রাঃ) থেকে। আল্লাহ্ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখুন যারা হুসায়েন (রাঃ)-এর সাথে বন্ধুত্ব রাখে।

সকল মুসলমান তাঁর পুণ্য, খোদা-ভীতি ও উচ্চ বুযর্গী সম্বন্ধে অবহিত আছে। কারবালার রণক্ষেত্রে তিনি (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা ত্যাগ ও কুরবানীর যে দৃষ্টান্ত দেখান, পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ যারা তাঁর সঙ্গী ছিলেন একজন একজন করে তাঁর চোখের সম্মুখে শহীদ হতে থাকেন, কিন্তু অত্যাচারী ও সত্যের বিরোধীদের সম্মুখে নিজের প্রিয়গণও পর্যায়ক্রমে দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করতে করতে উৎসর্গীত হয়ে যান অথচ এক দৃষ্কৃতকারী অপরাধীর আনুগত্যকে স্বীকার করেন নি। যেন তিনি এ শিক্ষা দিলেন যে, সত্যতা জীবন ও প্রাণ থেকেও মূল্যবান। এ কুরবানীর ফল এই হলো যে, আল্লাহ্‌তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের সেবকদলকে তাঁর (সঃ) ভবিষ্যদ্বংশধরদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন এবং তাঁকে খোদা-ভীরুগণের নেতা ও ইমাম বানান। যেভাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) স্বীয় স্ত্রী ও পুত্রকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে কুরবানী করেছিলেন আর খোদা এর বদলে অনেক ফল দান করলেন এমন কি যে, স্বয়ং ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কল্যাণমন্ডিত সত্তাও এই পরিবারের মধ্যেই জন্ম নেন। এ সত্তা (সঃ) ছিলেন সমস্ত পরম গুণাবলীর আধার। এভাবে হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)ও আবার হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ন্যায় কুরবানী দেন। তাই আল্লাহ্‌তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত পুণ্য ও নিষ্ঠাবানদের একটি বিরাট দলকে তাঁর (রাঃ) বংশে জন্মগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ইতিহাসের ব্যাপারে যতটা প্রশ্ন তা থেকে জানা যায় যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর পরে লোকেরা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর নিকট বয়াত হন। কিন্তু তিনি (রাঃ) ফেতনা-ফাসাদকে এড়াবার জন্যে নিজের অধিকার পরিহার করেন। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর খেলাফত থেকে হাত ধুয়ে ওঠার পরে আমীর মুয়াবিয়া খলীফা হয়ে গেলেন, পরে নিজ জীবদ্দশায়ই তার পরে ইয়াযীদকে খলীফা মনোনীত করে দেন। মদীনায় উম্মতের কতিপয় বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের, ইমাম হুসায়েন এবং আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) এ বয়াতের বিরোধী ছিলেন । আমীর মুয়াবিয়ার পরে যখন ইয়াযীদ খলীফা হলো তখন সে সর্বপ্রথম নিজের দৃষ্টি ঐসব লোকের বয়াত নেয়ার দিকে মনোনিবেশ করলো এবং মদীনার গভর্নর ওলীদ-বিন-ওকবাহ্ বিন আবূ সুফিয়ানকে লিখলো যে, ঐসব লোককে নিজের নিকট ডেকে সময় না দিয়ে বয়াত নিয়ে নাও।

ওলীদ প্রথমে ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-কে ডাকলেন, পত্র দেখালেন এবং বয়াত হওয়ার আবেদন করলেন। তিনি আমীর মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে **ইন্নালিল্লাহ্** পাঠ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ভাল ভাল কথা বল্লেন, দোয়া করলেন এবং পরে বল্লেন, আমার মত লোক গোপনে বয়াত হবে না। তুমি যে সময়ে সব লোককে বয়াতের জন্যে ডাকবে তখন আমাকেও ডাকবে, ঐ সময়ে দেখা যাবে। ওলীদ শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর (ইমাম হুসায়েনের) কথা মেনে নিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের ঐ কথা শুনে মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। এর পরে ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-ও তাঁর পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে চল্লেন। মুহাম্মদ বিন হানফীয়াহ্ তাঁকে অনেক বুঝালেন এবং বিরত রাখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি বিরত হলেন না।

ইমাম হুসায়েন (রাঃ) মক্কায় গেলে তার নিকট লোকের ভীড় লেগে থাকতো। ইতিহাস থেকে যতটা অবহিত হওয়া যায় যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর পরে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর নিকট লোকেরা বয়াত হন। তিনি ফেতনা-ফাসাদকে এড়িয়ে চলার জন্যে নিজের অধিকারকে পরিহার করেন। হযরত ইমাম হাসানের খেলাফত থেকে দাবী প্রত্যাহারের পরে আমীর মুয়াবিয়া খলীফা হয়ে গেলেন।

কুফাবাসীদের আহ্বান ও পত্রাদি ঃ

কুফাবাসীদের অবস্থাও ছিলো আশ্চর্য ধরনের। একদিকে তারা আমীর মুয়াবিয়ার খুবই বিরোধী ছিলো এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রেমিক সাজতো। অন্যদিকে যখন আমীর মুয়াবিয়ার সাথে সংঘর্ষের সময় আসতো তখন তারা মাঠ ছেড়ে পালিয়ে যেতো। হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে তারা এমন আচরণই করতো। আর এ অবস্থাই হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হলো ; কিন্তু তাদের এ কাপুরুষতার স্বভাব সত্ত্বেও তাদের সুযোগ মিলে যেতো। আহলে বায়তের প্রেমিক সেজে মাঠে তারা অবশ্যই এসে যেতো যদিও বা তাদের পালিয়ে যেতেই হতো। সুতরাং আমীর মুয়াবিয়ার মৃত্যু ও ইয়াযীদের সিংহাসন আরোহণের পরে স্বাভাবিকভাবেই এ (তথাকথিত) আলী প্রিয়গণ পুনরায় মাঠে অবতীর্ণ হলো। হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর মক্কা পৌছার পরে তারা শত শত পত্র লিখে তাঁর নিকটেও আবেদন করা আরম্ভ করলো যে, সমগ্র ইরাক আপনার পেছনে আছে। আপনি কুফায় এসে আমাদেরকে ও সমগ্র মুসলমানদেরকে ইয়াযীদের অপবিত্র শাসন থেকে মুক্তি দিন।

তারা কেবল ইহাকেই যথেষ্ট মনে করে নি বরং একবার তাঁর নিকটে মক্কায় প্রতিনিধিদলও পাঠালো এবং আবেদন করলো যে, কুফাবাসী ও সমগ্র ইরাক আপনার সাথে আছে। আপনি আমাদের এখানে এসে শাসন ভার হাতে নিন। সুতরাং ইমাম হুসায়েন (রাঃ) ইহাকে সুসংবাদ মনে করে স্বয়ং যাওয়ার পরিবর্তে প্রথমে নিজের চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় পাঠিয়ে দেন। ঐদিকে ইয়াযীদও অবহিত ছিলো যে, লোকদের মন ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর দিকে আকৃষ্ট ছিলো।

১৮ হাজার কুফাবাসীর বয়াত

সুতরাং মুসলিম বিন আকীল কুফা রওয়ানা হয়ে গেলেন যেন তিনি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং সংবাদ দেন যে, আসলে অবস্থাটা কী! যখন মুসলিম বিন আকীল কুফা পৌঁছুলেন কুফাবাসী তাঁকে খুবই সম্মান দেখালেন। লোকেরা সোৎসাহে এগিয়ে আসতে লাগলেন এবং তাঁর হাতে ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে বয়াত হতে থাকলেন। এ সময়ে কুফায় গভর্ণর ছিলো নু'মান বিন বশীর। আকীল (রাঃ) মুখতার বিন ওবায়েদের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। যখন গভর্ণর জানতে পারলো তখন সে এসে সতর্ক করলো কিন্তু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলো না । এ সাবধানতার পরে আকীল হানী বিন উরওয়াহ্ এর বাড়িতে অবস্থান করতে লাগলেন। হানী আহলে বায়তকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর বাড়িতে আসার পরে ১৮ হাজার কুফাবাসী ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর খেলাফতের উদ্দেশ্যে বয়াত হন। মুসলিম বিন আকীল ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-কে এ অবস্থা লিখে দেন এবং তাঁকে চলে আসতে বলেন। কিন্তু কুফার গুপ্তচররা শীঘ্রই এ ঘটনা ইয়াযীদকে অবহিত করে। ইয়াযীদ বিচলিত হয়ে পড়ে। সে বসরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদকে আদেশ দিলো যে, শীঘ্র কুফায় পৌঁছে এ আন্দোলনকে প্রশমিত করো। হানীকে কুফা থেকে বের করে দাও বা হত্যা করো। সুতারাং ঐ অত্যাচারী ও শক্তিশালী গভর্ণর রসূল (সঃ)-এর পরিবারের শত্রু সেখানে পৌঁছেই হানী বিন উরওয়াহ্কে বেজায় মারপিট করে। কুফায় খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, ইবনে যিয়াদ হানীকে মারতে মারতে হত্যা করে ফেলেছে। আকীল বিন মুসলিমের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলো। যেহেতু হানী স্বয়ং তাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলো তাই মুসলিম বিন আকীল নিজের ১৮ হাজার লোক নিয়ে মোকাবেলা করার জন্যে বের হলেন। এ সময়ে ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের নিকট ছিলো মাত্র ৩০ জন সৈন্য এবং কুফার কতিপয় গোত্রপতি। ইবনে যিয়াদ এ গোত্রপতিদের বল্লো, নিজ নিজ লোকদেরকে বুঝাও যে, তারা যেন বিরত হয় নচেৎ কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। এভাবে লোকদেরকে ভয় দেখানো হলো। তদুপরি ঘোষণা করা হলো যে, যে আমীরের আনুগত্য করবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এ ঘোষণার পরে সমস্ত আহলে বায়ত-প্রিয়গণের সকল উদ্দীপনা শীতল হয়ে গেলো অথচ ইতঃপূর্বে তারা ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর বয়াত হয়েছিলো। কেবল মাত্র ৩০ ব্যক্তি মুসলিম বিন আকীলের সাথে থাকলো। মুসলিম বিন আকীল নিজ শাহাদতের পূর্বে উমর বিন সা'আদকে এই ওসীয়্যত করেছিলেন যেন হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-কে এ সব ঘটনা জানানো হয় আর তিনি যেন রাস্তা থেকে ফিরে যান। মুসলিম বিন আকীলকে একাকীই সৈন্যদের মোকাবেলা করতে হলো। পরিশেষে তাঁকে ইবনে যিয়াদের নিকট আনা হলো এবং তাঁকে শহীদ করে দেয়া হলো।

হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর কুফায় যাত্রারম্ভ

যেহেতু হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ) ভাল সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি প্রস্তুতি নিলেন। শুভাকাঙ্ক্ষীরা নিষেধ করেছিলেন। বিশেষ করে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস না যাওয়ার জন্যে জিদ ধরেছিলেন অথবা কমপক্ষে পরিবারবর্গকে যেন না নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তকদীরের লিখন ইহাই ছিলো যে, সমগ্র চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হলো। তিনি রওয়ানা দিলেন। পথে আকীলের শাহাদতের খবর পেলেন। তিনি খুবই দুঃখ পেলেন। সঙ্গীরা বল্লেন, এমতাবস্থায় আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করুন। কিন্তু আকীলের ভাইয়েরা বল্লো, আমরা তো ভাইয়ের রক্তের বদলা নিবো অথবা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিবো। কাফেলা সম্মুখে অগ্রসর হলো। পরে উমর ইবনে সা'আদের দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো যিনি আকীল-এর ওসীয়্যত মোতাবেক ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-কে বাধা দেবার জন্যে এসেছিলেন। তার নিকট থেকে অবস্থা সম্বন্ধে জানার পরে তিনি (রাঃ) সঙ্গী-সাথীদের ফিরে যেতে বল্লেন। আকীল ও হানীকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। সমগ্র কুফাবাসী বিগড়ে গেছে। নিজেদের প্রাণকে বিপদের সম্মুখে নিক্ষেপ কোর না । সুতরাং যেসব লোক পথে যোগদান করেছিলো তারা তো ফিরে গেলো কিন্তু অবশিষ্ট আহলে বায়ত তাঁর সাথেই থেকে গেলো। কুফাবাসীদের ওপরে দাপট ও কর্তৃত্ব সৃষ্টি করার পরে ইবনে যিয়াদ শহরের প্রবেশ দ্বারগুলো বন্ধ করে দেয় আর হুর বিন ইয়াযীদকে এক হাজার আরোহী বাহিনীর একটি দল নিয়ে ইমাম হুসায়েনের খোঁজে পাঠায়। সুতরাং কিছু দূরত্বেই ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর সাথে হুরের বাহিনীর সাক্ষাৎ লাভ হলো। কথোপকথনের পরে সিদ্ধান্ত হলো যে, ইমাম হুসায়েন (রাঃ) কোন অপরিচিত রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করবেন। ভীষণ গরমের দিন ছিলো। হুরের বাহিনীও পিপাসার্ত ছিলো। জঙ্গলে কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাঁর (রাঃ) সাথে ছোট্ট ছোট্ট শিশু ও মহিলারা ছিলো। তিনি (রাঃ) তাঁর সাথের পানি শত্রু সৈন্যদের পান করিয়ে দেন । হুর-এর সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর দল অপরিচিত পথে রওয়ানা দিলেন। তিন চার দিন পরে মুহাররমের দ্বিতীয় তারিখ ঐ কাফেলা কারবালার প্রান্তরে পৌঁছে এবং ফোরাত নদীর নিকটে থেমে যায়। দ্বিতীয় দিন ইবনে যিয়াদ কর্তৃক প্রেরিত উমর ইবনে আসাদ-এর নেতৃত্বে এক বাহিনী কারবালা পৌঁছে। এর পরে ইয়াযীদের আরও সৈন্য বাহিনী আসতেই থাকলো। চতুর্দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হলো। ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-কে সৈন্যরা ঘিরে ফেলে ইয়াযীদের বয়াত হওয়ার জন্যে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। সপ্তম দিনে ইবনে যিয়াদের আদেশে নদীতে পাহারা বসানো হয় আর নিষ্পাপ শিশুরা পানির জন্যে হা হুতাশ করতে থাকে।

এক দুষ্কৃতকারী পাপী শাসককে ধর্মীয় নেতা স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে কোন কঠিন চাপ ও নির্যাতন ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-কে বাধ্য করতে পারে নি। আট তারিখে উমর ইবনে আসাদ ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-কে বল্লো, এখনও সুযোগ আছে ইয়াযীদের বয়াত হয়ে যান এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করুন। কিন্তু ইমামের ধৈর্য ও স্থৈর্যে কোন ইতর বিশেষ হলো না। তিনি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করলেন। একদিকে ইরাকী সৈন্য অন্য দিকে ছিলেন কেবল ৮০ ব্যক্তি। সুতরাং ঐতিহাসিক সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ইমাম হুসায়েন (রাঃ) সঙ্গীদের বল্লেন, আমার সাথে অযথা প্রাণ দিও না। কিন্তু মহিলা ও শিশুরা তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করতে রাজী হলেন না। তাঁর বোন যখন ভাই এবং পরিবারের অন্যান্য লোকদের নিজের চোখের সম্মুখে মৃত্যুর মুখে যেতে দেখতে পেলেন তখন কান্না শুরু করে দিলেন। তিনি (রাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলো। তিন দিন অভুক্ত ও পিপাসার্ত থাকা সত্ত্বেও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে থাকলেন। এক এক করে বাহাদুরীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

তিনি (রাঃ)ও ৩দিনের পিপাসার্ত ছিলেন। তিনি (রাঃ) এক চুমুক পানি পান করতে চাচ্ছিলেন এমন কি যে, এক পাপিষ্ঠ এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করলো যে, তাঁর চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো। তিনি ছিলেন খুবই পিপাসার্ত আর ক্লান্ত। সৈন্যরা তাঁর পবিত্র মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল্লো এবং এভাবে তিনি (রাঃ) সত্যের জন্যে শাহাদত বরণ করে নিলেন।

জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা

৪০ হিজরীর পবিত্র ১০ তারিখে শহীদদের নেতা আলাহেস্ সালাম সত্যের সমর্থনে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। তিনি (জামাতের আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা-অনুবাদক)(আঃ) বলেন ঃ 'কারাবালা প্রান্তরে ইয়াযীদের সৈন্যদের পক্ষ থেকে মুস্তাফা (সঃ)-এর পরিবারবর্গের ওপরে যে নির্যাতন চালানো হয় উহা প্রত্যেক সহানুভূতিশীল মুসলমানের প্রাণে রক্তক্ষরণ করে। এ ঘটনা হযরত ইমাম হুসায়েন আলায়হেস্ সালামের দীপ্তিমান মকাম ও মর্যাদা সর্বকালের জন্যে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম বলেন যে, আমি এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বীয় জামাতকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমরা দৃঢ়-বিশ্বাস রাখি যে, ইয়াযীদ একটি অপবিত্র স্বভাববিশিষ্ট মাটির পোকা এবং অত্যাচারী ছিলো। আর যে অর্থ ও উদ্দেশ্যে কাউকে মু'মিন বলা হয় ঐ সব তার মধ্যে মজুদ ছিলো না। মু'মিন হওয়া কোন সহজ বিষয় নয়। আল্লাহ্তাআলা এসব লোকদের সম্বন্ধে বলেন- কুলাতিল আ'রাবু আমান্না কুল লাম তু'মিনূ ওয়া লাকিন কুলু আসলামনা। (মরু-বাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলে দাও, তোমরা ঈমান আনো নি বরং বলো, আমরা মুসলমান হয়েছি)। ঐ সকল লোক মু'মিন হয়ে থাকে যাদের কর্ম তাদের ঈমানের সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। তাদের প্রাণে ঈমান লেখা হয় যারা নিজেদের খোদা এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সব কিছুর ওপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং তাকওয়া ও খোদা-ভীতির সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ পথসমূহকে খোদার জন্যে অবলম্বন করে আর তাঁর ভালবাসায় নিমগ্ন হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি বস্তু যা মূর্তির ন্যায় খোদার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়- হোক না তা চারিত্রিক অবস্থা বা দুষ্কৃতিপূর্ণ কর্ম অথবা অমনোযোগিতা ও আলস্য যা নিজ সত্তাকে সবচে' দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ইয়াযীদের যে, এসব বিষয় তার মধ্যে ছিলোই না। পৃথিবীর আকর্ষণ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলো। কিন্তু হুসায়েন (রাঃ) পবিত্র ও পবিত্রকৃত ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে ঐ মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদের খোদাতাআলা সহস্তে পরিবর্তন করেন এবং নিঃসন্দেহে পর জগতে বেহেশ্তের অধিকারী করেন এবং তাঁর ব্যাপারে সামান্য পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমানের ক্ষতির কারণ হবে। এই ইমাম খোদা-ভীরুতা, ভালবাসা, ধৈর্য ও স্থৈর্য, সাধনা ও ইবাদতে আমাদের জন্যে উচ্চ আদর্শস্বরূপ এবং আমরা এই নিষ্পাপ সত্তার হেদায়াতের অনুসরণকারী যা কিনা তিনি লাভ করেছিলেন। যে তাঁর শত্রু তার অন্তর বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সফলতা লাভ করেছে ঐ প্রাণ যা কর্মের আকারে তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে এবং তার ঈমান, চরিত্র, বীরত্ব, খোদা-ভীরুতা, ধৈর্য-স্থৈর্য, এবং ঐশী ভালবাসার সর্বপ্রকার নক্শা ছাপ হিসেবে পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে, যেভাবে একটি স্বচ্ছ দর্পণে একজন খুব সুন্দর মানুষের নক্শা থাকে। এসব লোক দুনিয়ার দৃষ্টির অগোচরে থাকেন। কে তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত? কেবল সে-ই জানে, যে তাঁর অন্তর্ভুক্ত থাকে। পৃথিবীর দৃষ্টি তাকে সনাক্ত করতে পারে না। কেননা, তিনি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদত এ কারণেই হয়েছিল। কেননা, তাঁকে সনাক্ত করা হয় নি। দুনিয়া কোন্ পবিত্র ও মনোনীত সত্তাকে তাঁর জীবদ্দশায় ভালবেসেছে যে, হুসায়েন (রাঃ)-কেও ভালবাসবে ? মোট কথা এ বিষয় খুবই নিম্ন মানের পাপিষ্ঠতা ও বেঈমানীর অন্তর্ভুক্ত যে, হুসায়েন (রাঃ)-কে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। আর যে ব্যক্তি হুসায়েন (রাঃ) বা অন্য কোন বুযর্গ ব্যক্তির যে উম্মতের পবিত্র ইমামদের অন্তর্ভুক্ত, হেয় দৃষ্টিতে দেখে বা কোন নিন্দাপূর্ণ বাক্য তাঁর প্রসঙ্গে নিজের জিহ্বায় আনে সে নিজের ঈমানকে ধ্বংস করে। কেননা, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ্ তার শত্রুতে পরিণত হয়, যে তাঁর বুযর্গ ও প্রিয় বান্দাদের শত্রু। (ফতওয়া মসীহে মাওউদ, ফুরকান পত্রিকা জুলাই ১৯৫৮ এর বরাতে)।

বর্তমান কালে যে রঙ্গে এ বেদনাদায়ক স্মৃতিকে স্মরণ করা হয়ে থাকে আহাদীস ও কুরাআনী শিক্ষা থেকে ইহা বহু দুরে ! মাজমাউল বাহরাইনে আদেশানুযায়ী দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের সময়ে ইন্নালিল্লাহ্ ... বলা হয়।

যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করার আ আছে যে, সঠিকভাবে শোক প্রকাশ করার সময় ধৈর্য ও স্বস্তিকে সমুন্নত রাখা হয় এবং এর সঠিক পদ্ধতি হলো এই যে, আল্লাহ্র দেশ দেয়া হয়েছে এবং সর্বপ্রকার কান্না-কাটি, বুক-চাপড়ানো, বিলাপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ তাই আর কোন্ ব্যক্তি আছে যাঁর জন্যে এসব কর্মকান্ড বৈধ হবে ? আর হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট হুযূর (সঃ)-এর মৃত্যু দুনিয়ার সকল দুর্ঘটনা থেকে বড় দুর্ঘটনা বলে গণ্য, যেমন কিনা এর উল্লেখ হায়াতুল কুলূবের ৪৩৪ পৃষ্ঠায় আছে।

হুযূর (সঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ

তিনি (সঃ) ওসীয়্যতের আকারে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ "হে ফাতিমা! যখন আমার মৃত্যু হবে তখন আমার জন্যে মুখমন্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করবে না। চুলকে উশ্কো-খুশ্কো করবে না। বিলাপ করবে না। আমার জন্যে বুক চাপড়াবে না এবং বুক চাপড়ানো লোকদের ডাকবে না (হায়াতুল কূলুব-এ উদ্ধৃতি শিয়াদের পুস্তক থেকে)।

হযরত হামযা (রাঃ)-কে যে নিষ্ঠুর ও বিভৎস পন্থায় শহীদ করা হয়েছে তা ইসলামের ইতিহাসের পাতার উজ্জ্বল ঘটনা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ সময়ে কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন ? লেখা আছে- "এ ঘটনায় হুযূর (সঃ) বিলাপ করেন নি, হা হুতাশ করেন নি। কান্না-কাটিতেও প্রবৃত্ত হন নি" (হায়াতুল কুলূব, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬)।

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর (সঃ) মৃত্যুর পরে সর্বপ্রকার বিলাপ ও মাতম করাকে নিষেধ করেছেন"। সুতারাং আজ শিয়া ভ্রাতৃবৃন্দকে এসব বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি রেখে চিন্তা করা দরকার যে, তারা নিজেদের প্রিয় নবী (সঃ)-ও বুযর্গদের আদেশকে কতটা পালন করছে না।

আজাতো সুন্নী মুসলমানও তাযীয়া তৈরী করে উহাকে খুবই সজ্জিত করে প্রতিযোগিতা করে থাকে এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। এমন অনৈসলামিক কার্যক্রম দৃষ্টিতে চলে আসে যে, একজন প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মুসলমানের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। সুতরাং দোয়া করি যে, আল্লাহ্তাআলা সকলকে প্রকৃত ইসলাম শিখার সৌভাগ্য দান করেন এবং শিরক্ ও বি'দাত থেকে রক্ষা করেন, আমীন।

(সাপ্তাহিক বদর, ১৫-২২ মে, ১৯৯৭ এর সৌজন্যে)

অনুবাদ- **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

এম.টি.এ–খোদার এক মহাদান

[বাংলাদেশের ৭৫তম সালানা জলসায় হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি
মোহতারম মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেবের বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ]

হাদীসে লেখা আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র সমীপে নিবেদন করেন *'রাব্বি আজিদু ফিল আল্‌ওয়াহি কুওমান* – হে আমার আল্লাহ্ তুমি আমাকে যে কাষ্ঠফলক দিয়েছ আমি সেই কাষ্ঠফলকে এমন জাতির পরিচয় পাচ্ছি। *'ইউতওনাল ইলমাল আওয়ালা ওয়াল্ আখারা'* যাদের শুরুর এবং শেষের জ্ঞান দান করা হবে। *'ফাইয়াকতুলুনা কুরুনায্‌যালালাতে আদদাজ্জালা'* এবং ঐ জ্ঞানের কারণে তারা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত দাজ্জালের মোকাবেলা করতে থাকবে। *'ফাজআলহা উম্মাতী'*- হে আমার আল্লাহ্! ঐ জাতি যারা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত দাজ্জালের মোকাবেলা করবে, সেই জাতিকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও, এটাই আমার নিবেদন। 'কালা তিলকা 'উম্মাতু আহমদা' আল্লাহ্‌তাআলা জবাব দিলেন, হে মূসা। সেই জাতি যারা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত দাজ্জালের মোকাবেলা করবে, তারা তোমার জামাত নয়- আহমদের জামাত হবে।

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত, যাদের ভাগ্যে শেষ যুগে দাজ্জালের মোকাবেলা করা নির্ধারিত তারা দাজ্জালি ফিৎনার মোকাবেলা কেবল এক/দুই বছর নয় বরং *'কুরুনায্ যালালাতে'* কয়েক শতাব্দি ব্যাপী করতে থাকবে। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ঐ জামাতের দাজ্জালি ফিৎনার সঙ্গে মোকাবেলা চলতে থাকবে। অতঃপর কোন এক সময়ে ঐ ফিৎনার অবসান ঘটবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ইসলামের এই মহান বিজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আজকের দিন থেকে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ না হতেই অধিকাংশ বিশ্ববাসী ইসলাম গ্রহণ করবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯১৫ সনের জলসা সালানার বক্তৃতায় বলেন ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ঃ 'আজকের দিন থেকে তৃতীয় শতাব্দী পুর্ণ না হতেই বিশ্ববাসী ইসলাম গ্রহণ করবেঃ–এ ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ এই নয় যে, তৃতীয় শতাব্দী আগমনের পুর্বে ইসলাম বিজয় লাভ করবে না। বরং তৃতীয় শতাব্দীকে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয়ের সর্বশেষ সীমানা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে অবশ্য- অবশ্যই সমস্ত বিশ্বে ইসলাম বিজয় লাভ করবে। সুতরাং হুযূর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে যে শুভ সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলো পাঠের মাধ্যমে আমি এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সেই যুগ নিকটে এবং অতি দ্রুত সন্নিকটস্থ হচ্ছে। তখন বিভিন্ন দেশে গ্রাম, শহর, বস্তিসমূহ আহমদীয়তে প্রবেশ করবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ) খেলাফতের মসনদে উপবিষ্ট হয়েই এই ঘোষণা দেন যে, 'ঐশী শুভ সংবাদ পাঠ করে আমি যে ফল বের করেছি তা হলো আগামী ২৫/৩০ বছর আহমদীয়তের ইতিহাসে একটি পটপরিবর্তনের ভূমিকা রাখবে'। তিনি বলেন যে, আহমদীয়তের প্রথম শতাব্দী যা ১৮৮৯ থেকে শুরু হয়ে ১৯৮৯ তে শেষ হবে তা ইসলামের বিজয়ের প্রস্তুতির শতাব্দী। আহমদীয়তের দ্বিতীয় শতাব্দী যা ১৯৮৯ থেকে আরম্ভ হবে তা ইসলামের বিজয়ের অভ্যর্থনার জন্য নির্ধারিত।

বন্ধুগণ! আহমদীয়তের ঐ দ্বিতীয় শতাব্দীতে যখন আমরা ইসলামের বিজয়ের অভ্যর্থনা করব তা ১৯৮৯ থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে ১৯৯৯ সালে এসেছে অর্থাৎ অভ্যর্থনা শতাব্দীর প্রথম দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে, আমরা সেই শুভ সংবাদ পৃথিবীর কোণে কোণে পূর্ণ হতে দেখছি।

গত কয়েক বছর যাবৎ খোদাতাআলা আমাদেরকে M.T.A-এর ন্যায় এত বড় নেয়ামত দান করেছেন যা পৃথিবী সৃষ্টি অবদি কখনো কোন নবী বা খলীফার যুগে খোদাতাআলা কোন জাতিকে দান করেন নি। প্রাথমিক যুগের জাতিসমূহের অবস্থা চিন্তা করুন। ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী এসেছেন, প্রত্যেক নবীর যুগে যে খলীফাগণ ছিলেন আমরা তাদের সংখ্যা গণনাও করতে পারব না। কোন নবী বা খলীফার যুগে এমন মাধ্যম available ছিল না যদ্বারা ঐ যুগের প্রতেকটি ব্যক্তি স্বীয় নবী বা খলীফাদের নিকট পৌছতে পারত, তাঁর পবিত্র অস্তিত্বের দর্শন লাভ করতে পারত, তাঁর বাক্যাবলী স্বীয় কর্ণে শ্রবণ করতে পারত এবং তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করতে পারত। কোন নবী বা খলীফারও এই সাধ্য ছিল না যে, স্বীয় যুগের মানুষদের নিকট নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করতে পারতেন বা নিজ ভাষার মাধ্যমে ধর্মের শিক্ষা দিতেন। হয়ত কয়েকশত বা কয়েক হাজার মানুষ স্বীয় যুগের নবী বা খলীফার কাছে পৌছাতে পারত। স্বল্পসংখক মানুষ তাদের যুগের নবী বা রসূলদের সাহচর্য লাভ করত। ঐসব লোকেরা পরবর্তীতে সেই পয়গাম অন্যদের কাছে পৌছাত। অতঃপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তীদের নিকট সেই পয়গাম পৌছত। এভাবেই ধারাবাহিকতা চলতে থাকত।

আজ খোদাতাআলা আমাদেরকে M.T.A- এর ন্যায় ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার মাধ্যম দান করে এমনভাবে পুরস্কৃত করেছেন যা আমরা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, সেনাপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মীয় নেতা রয়েছেন, তবে কেবলমাত্র আহমদীয়া জামাতের ইমাম ব্যতিরেকে আর কারও জন্যে এই নেয়ামত নেই যে, তিনি পৃথিবীর কোন কোণে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন আর তাঁর বক্তৃতা সেই সময়ই পৃথিবীর সকল জাতি শ্রবণ করে।

আমেরিকা সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। তথাপি আমেরিকার রাষ্ট্রপতিরও এই অবস্থান নেই যে, তিনি কোথাও দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবেন আর তার বক্তৃতা পৃথিবীর সকল জাতি সরাসরি শ্রবণ করবে। তার বক্তৃতার সময়ে কয়েকশত বা কয়েক হাজার শ্রোতা থাকে আবার সেইসব শ্রোতাদের মধ্যে বড় অংশই থাকে নিরাপত্তারক্ষী যারা সাদা পোশাকে সেখানে অবস্থান করে। অতঃপর বিভিন্ন দেশের রেডিও টিভির সংবাদে কয়েক বাক্যে তার বক্তৃতার সারাংশ বর্ণনা করে থাকে। তবে এমন অবস্থা যে, যখনই বক্তৃতা হচ্ছে ঠিক তখনই তার সম্পূর্ণ বক্তৃতা পৃথিবীর সকল জাতি একই সময়ে শ্রবণ করছে, খোদাতাআলার এমন ব্যবহার আহমদীয়া জামাতের ইমাম ব্যতীত অন্য কারও সাথে নেই। এটা কত বড় পুরস্কার! আমরা যা দেখছি তা ঐ শুভসংবাদগুলোর পূর্ণতার একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। আজ আধ্যাত্মিক জগতে কত বড় পরিবর্তন এসেছে! একদিকে টেলিভিশন নাচ-গান, নোংরা অনুষ্ঠান প্রচার এবং নৈতিকতাকে ধ্বংসের জন্য কুখ্যাত। অপরদিকে খোদার স্বীয় শুভসংবাদ অনুযায়ী সেই টেলিভিশনকেই নৈতিকতা রক্ষার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ধর্মচ্যুত করার জন্য নয় বরং ধর্মানুরাগী বানানোর জন্য খোদা টেলিভিশনকে ব্যবহার করাচ্ছেন।

একই সাথে আমরা দেখছি আহমদীয়া জামাতের ইমাম গত কয়েক বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক বয়াতের ঘোষণা দিচ্ছেন এবং সেই ঘোষণা জারীর সাথে সাথে খোদার ফিরিশ্‌তা, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইমামের

ঘোষণাকে পূর্ণ করার জন্য পৃথিবীতে ব্যস্ত হয়ে যায় এবং যাদুর ন্যায় সেই ঘোষণা পূর্ণ হয়ে চলছে। যুক্তরাজ্যের ১৯৯৮ সনের সালানা জলসায় আমি, আপনি এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতির আহমদী সদস্য স্বীয় চোখে অবলোকন করলাম যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পঞ্চাশ লক্ষাধিক মানুষ ঐ ইমামের হাতে বয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। আমাদের নিজ চোখে এই শুভ সংবাদগুলো পূর্ণ হতে দেখে আমাদের হৃদয়ে একটি জাজ্বল্যমান বিশ্বাস জন্মেছে যে, ঐ সমস্ত শুভসংবাদ তা-ই যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলীফাদের মাধ্যমে এ জামাতকে দান করা হয়েছিল। খোদাতাআলার ফযলে আমরা সেই শুভসংবাদগুলোর পূর্ণতা স্ব-চক্ষে অবলোকন করছি এবং আরো অবলোকন করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ্।

আমার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ! এই শুভসংবাদগুলোর পূর্ণতা, লক্ষ লক্ষ মানুষের আহমদীয়তে প্রবেশ, ঐসব মানুষ যারা কোন সময়ে পণ্ডিত ও পাদ্রীদের প্রভাবে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে গালি দেয়া ছাড়া নিদ্রা যেত না, দুনিয়া আজ সেসব ব্যক্তিদের এমন পরিবর্তন অবলোকন করছে যে, ঐসব ব্যক্তি বর্তমানে বিছানায় শুয়ে–*আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ* – দোয়া ব্যতীত নিদ্রাই যেতে পারে না। আমরা আজ স্ব-চক্ষে পৃথিবীতে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। এই পরিবর্তনের ধারা আমাদের দৃষ্টিতে একটি বিশ্বের দিকে আকর্ষণ করে আর তা হলো ঃ যখন কোন জাতির প্রতি খোদাতাআলার পুরস্কার বর্ষিত হয় আর সেই জাতিতে ঐশী শুভসংবাদ পূর্ণতা লাভ করতে থাকে তখন সেই ঐশী শুভসংবাদ সেই জাতির প্রতি কিছু দায়িত্বও ন্যস্ত করে। সে দায়িত্বাবলী কি ?

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেন, একসময় আসবে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ইসলামের দাসত্ব অবলম্বন করবে। তখন তারা এ কথা ভাববে যে, যদিও আমরা অমুক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছি, ইসলামী আদর্শের অমুক শিক্ষায় আমরা ইসলাম প্রেমিক হয়েছি, অথচ আমরা তো ইসলামের সমস্ত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত নই। অতএব হে ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ ! যারা আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছ, তোমরা যারা জন্মগত আহমদী তোমরা নিশ্চয় আমাদের তুলনায় ইসলাম উত্তমভাবে বুঝেছ। অতএব, আমাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দাও। খোদা না করুন যদি আমরাই ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত না থাকি আর তারা আমাদের থেকে এ দাবী করে যে তোমরা আমাদেরকে তবলীগ করেছ, খোদা আমাদের প্রতি দয়া করেছেন আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্*- এর দাসত্ব গ্রহণ করেছি তাই আমাদের বঞ্চিত কর না। আমাদের আঙ্গুল ধরে কুরআন শিক্ষা দাও, আমাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দাও। এমতাবস্থায় আমরা যদি তাদের শিক্ষা দেয়ার উপযুক্ত না হই, আমাদের বংশধররা নবাগতদের যদি কুরআন না শিখাতে পারে তাহলে আমাদের সম্পর্কে তাদের কি ধারণা জন্মাবে! আমরা এবং আমাদের বংশধর তাদের সম্মুখে কেমন লাঞ্ছিত হবে! তারা আমাদের সম্পর্কে কি মনে করবে? নবাগতরা বলবে, বড় অদ্ভুত আহমদী! তোমারা কেউ বংশানুক্রমিক আহমদী আর কেউবা প্রবীণ আহমদী তথাপিও তোমরা আমাদের কুরআন শিখাতে পার না! সুতরাং বন্ধুগণ নিজেদের এবং বংশধরদেরকে লক্ষ-লক্ষ নবাগতদের সম্মুখে এবং আল্লাহ্র সমীপে লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন! আজ আমাদের জন্য আবশ্যকীয় যে, আমরাও যেন কুরআন শিখি এবং আমাদের বংশধরদেরকেও যেন কুরআন শিক্ষা দিই। আমরা নিজেরা যেন ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করি এবং স্বীয় বংশধরদেরও যেন ইসলামের শিক্ষা দিই। আমরা নিজেরাও যেন ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করি এবং ভবিষ্যত বংশধরদেরকেও যেন ইসলামী শিক্ষায় আমল করায় অভ্যস্ত করি। এ প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্র সমীপে এবং লক্ষ কোটি নবাগতদের সম্মুখে লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারব।

নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন। এ কাজ তেমন কষ্টকর নয়। আমরা যদি প্রতিদিন ফজর নামাযের পর আল্লাহ্র কালাম কুরআন পাক থেকে কমপক্ষে ১ রুকূ তিলাওয়াত করি অতঃপর মাতৃভাষায় ঐ অংশের অনুবাদ এবং পাদটিকা পড়ি এবং সেই সাথে নিজেদের সন্তান-সন্ততির দেখা শুনা করি যে, তারা নামাযান্তে আল্লাহ্র কিতাব কুরআন করীমের এক রুকূ পড়ে কিনা- তার সঙ্গে অনুবাদ পড়ে কিনা তবেই আমরা উত্তমরূপে দায়িত্ব পালনকারী বলে সাব্যস্ত হব। আল্লাহ্র কালাম ব্যতীত অন্য কোন কিতাব ধর্মীয় শিক্ষার উৎস হতে পারে না। সমস্ত বিশ্ব-জগতই আল্লাহ্র কালামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। হাদীসে আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ খোদাতাআলা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, *'লাওলাকা লামা খলাকতুল আফলাক'* হে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)! যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করতাম না। অর্থাৎ খোদাতাআলা সমস্ত বিশ্ব-জগতকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? কালামুল্লাহ্র তবলীগের জন্য। আল্লাহ্র কালামকে পৃথিবীবাসীর কাছে পৌছানোর জন্য। এ কথা দু'টোকে যদি এক করেন তবে কি ফল দাঁড়াচ্ছে? সমস্ত বিশ্ব-জগতকে খোদাতাআলা স্বীয় কালাম কুরআন পাকের সেবা এবং এর উপর আমলের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্র কালাম নিজে পড়ুন এবং স্বীয় বংশধরদের পড়ান। নিজে আল্লাহ্র কালাম শিখুন, কালামের অর্থ শিখুন এবং বংশধরদের শিক্ষা দিন।

নিজেকে এবং নিজ বংশধরদের ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলঃ প্রতিদিন M.T.A. তে ৫/৬ বার হযরত খলীফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর প্রোগ্রাম প্রচারিত হয় সেগুলো রীতিমত দেখা। এ প্রোগ্রামগুলো একইসাথে বাংলায় অনূদিত হয়, তাই কারো হৃদয়ে এ ধারণা থাকা সঠিক নয় যে, অনুষ্ঠান তো উর্দূ, ইংরেজী, ফারসী এবং আরবী ভাষায় হয়ে থাকে-আমিতো সেই ভাষাগুলো বুঝি না। এ বিষয়ে কোন সমস্যাই নেই। দেখুন এটিওতো খোদার কম পুরস্কার নয় যে, প্রতিদিন ৫/৬ বার বিভিন্ন ভাষার অনুষ্ঠান সরাসরি বাংলায় অনূদিত হয়ে সম্প্রচারিত হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানের সময়সূচী নোট করে রাখুন। নিজের সুবিধানুযায়ী ঘরের জন্য প্রোগ্রাম তৈরী করুন। ইংরেজী প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বাংলা অনুবাদ সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। ফারসী ভাষায় প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনেরও তাৎক্ষণিক বাংলা অনুবাদ হয়ে থাকে। হুযূর (আইঃ)-এর খুতবাসমূহ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সরাসরি বাংলা অনুবাদ সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। অতএব, এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অমূলক যে, প্রোগ্রাম কি করে বুঝব? এ বিষয়ে যা প্রয়োজনীয় তা হলো ঃ খোদাতাআলা M.T.A.- এর মাধ্যমে জীবন প্রদানকারী যে নহর প্রবাহিত করেছেন আমরা যেন তা থেকে পান করি এবং আমাদের বংশধরদেরও পান করাই। আল্লাহ্তাআলা আমাকে, আপনাদেরকে এবং আমাদের বংশধরদেরকে কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষাসমূহ শেখার ও তদনুযায়ী আমল করার এবং পৃথিবীকে শেখানোর তৌফীক দান করুন। আমীন ॥

(অডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি অনুবাদ)

অনুবাদ–মাওলানা বশীরুর রহমান, সদর মুরব্বী।

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(২৪তম কিস্তি)

হযরত উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ

সংক্ষেপে হযরত উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু মতভেদ আছে। কারো মতে তিনি বিশিষ্ট লোকদের, যেমন হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং সর্বস্তরের নও মুসলিমদের অপূর্ব দৃঢ়তা দেখে তাঁর মনে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিলো। তিনি নিজে পরিবারের দু'জন দাসীর উপর চরম অত্যাচার করেও তাঁদেরকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে পারেন নি। ভাবছিলেন হয়তো তাতে কিছু রহস্য বা মহিমা লুকিয়ে আছে। অপরদিকে তিনি ভাবছিলেন হয়তো হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে হত্যা করলে সব গোলমাল চুকে যাবে, পিতৃ-ধর্মও রক্ষা পাবে।

ইতোমধ্যে তাঁর বোন ফাতিমা ও বোনাই সাঈদ গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন– যা তাঁর জানা ছিল না। অপরদিকে তাঁরই বংশের লোক নঈম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, জানতে পারলেন। পথে নঈমের সাথে সাক্ষাৎ হলে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে পিতৃ-ধর্ম ত্যাগের কথা জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে নঈম সাঈদ ও ফাতেমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়ে দিলেন।

হযরত উমর অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় বোন ও বোনাইর সাথে বুঝাপড়া করার জন্য তাঁদের বাড়ি গেলেন। দরজায় পৌঁছে তিনি কিছু শব্দ শুনতে পেলেন। কে যেন মধুর সুরে কিছু পাঠ করছেন। এই পাঠক ছিলেন হযরত খাব্বাব (রাঃ)। তিনি হযরত উমরের বোন ও বোনাইকে কুরআন শরীফ শিখাচ্ছিলেন। হযরত উমরের পায়ের শব্দ শুনেই খাব্বাব (রাঃ) ঘরের এক কোণে লুকিয়ে পড়লেন। ফাতেমা কুরআন শরীফের পাতাগুলোও সরিয়ে ফেল্লেন। হযরত উমর ক্রোধান্বিত সুরে বল্লেন, 'আমি শুনলাম, তোমরা নাকি তোমাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছ' ? একথা বলেই তিনি ভগ্নীপতিকে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেলেন। ফাতেমা স্বামীকে রক্ষা করতে ছুটে আসেন এবং উমরের আঘাতে আহত হন। ফাতেমার নাক হতে দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে। ফাতেমা তখন দৃঢ়তার সাথে বল্লেন, 'হ্যাঁ, উমর একথা সত্য যে, আমরা আমাদের এই ধর্ম কখনই পরিত্যাগ করবো না। তোমার যা খুশী করতে পারো।' একথায় হযরত উমরের মানসিকতায় বিরাট পরিবর্তন দেখা দিলো। বোনকে তিনি বল্লেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমাকে শোনাও তো সেই কালাম, যা তোমরা তখন তেলাওয়াত করছিলে'। ফাতেমা বল্লেন, 'না আমি দেখাবো না। তুমি গুগোলো নষ্ট করে ফেলবে।' উমর নরম সুরে বল্লেন, না, তা করবো না। তখন ফাতেমা বল্লেন, 'তুমি তো নোংরা, আগে গোসল করে আসো, তবো দেখাবো।' অনুশোচনার কারণে তখন উমরের অবস্থা এমনই হয়েছিলো যে, তিনি সবকিছুই করতে রাজি ছিলেন এবং গোসলও করে আসলেন। ফাতেমা তাঁর হাতে কুরআন পাকের পাতাগুলো দিলেন। এতে সূরা 'ত্বা-হা'র কিছু আয়াত ছিলো। সেসব পড়তে পড়তে তিনি যখন এ আয়াত পর্যন্ত পড়লেন (বাংলা তর্জমা)ঃ 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, সুতরাং তুমি আমারই এবাদত কর এবং আমারই স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি উহা শীঘ্রই প্রকাশিত করবো, যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার চেষ্টানুযায়ী কর্মের ফল দেয়া যেতে পারে' (২০ঃ১৫-১৬)।

তখন সহসাই তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে এলো, কী আশ্চর্য ! কি পবিত্র বাণী !' একথা শুনা মাত্র খাব্বাব (রাঃ) বের হলেন এবং বল্লেন, 'এতো রসূলে করীম (সঃ)-এর দোয়ারই ফল ! খোদার কসম ! গতকাল আমি শুনেছি, তিনি এই দোয়া করেছেন ঃ

'ইলাহী ! উমর ইবনে খাত্তাব এবং উমর ইবনে হিশাম এদের মধ্যে যে কোন একজনকে তুমি জরুর ইসলামের দিকে হেদায়াত দাও।'

উমর বল্লেন, আমাকে বলো, মুহাম্মদ (সঃ) কোথায় আছেন। তাঁকে বলা হলো, তিনি দারুল আরকামে আছেন। তিনি উলঙ্গ তরবারি হাতেই সেখানে পৌঁছলেন ও দরজার কড়া নাড়লেন। সাহাবারা (রাঃ) দরজার ফাঁক দিয়ে হযরত উমর (রাঃ)-কে ঐ অবস্থায় দেখে ও বিপদের আশংকা করে দরজা খুলে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বল্লেন, 'কি হয়েছে ? দরজা খুলে দাও।' তরবারি হাতে উমর ঘরে ঢুকে পড়লেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বল্লেন, 'উমর কি নিয়্যতে এসেছ ?' উমর বল্লেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমি মুসলমান হতে এসেছি।' একথা শুনেই রসূল করীম (সঃ) উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, আল্লাহো আকবর' (আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ)। উপস্থিত সকল সাহাবাও একই সঙ্গে তকবীর দিয়ে উঠলেন, আল্লাহো আকবর।' তারা এত জোরে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে তা প্রতিধ্বনিত হলো। এ খবর দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। ইসলামের জন্য হযরত উমরকে চরম নির্যাতন সইতে হয়েছে। যে উমর মুসলমানদের নির্যাতন করতে কারো পিছনে ছিলেন–একথা বলা যাবে না, যে উমর হুযূর (সঃ)-কে হত্যা করতে বের হয়েছিলেন সে উমর হুযূর (সঃ) ও ইসলামের জন্য প্রাণ দিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। দুনিয়ার বুকে এমন বিয়োগান্তক ও মিলনান্তক ঘটনা খুবই বিরল, এমনকি কল্পনার গল্প উপন্যাসেও খুঁজে পাওয়া ভার।

হযরত উমর (রাঃ) দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে ইসলাম ও মানবতার যে খেদমত করে গেছেন তা কোনদিন ম্লান হবে না–একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। তাঁর একটি কথার উল্লেখ করলেই উপলব্ধি করা যাবে তিনি কত বড় হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'ফোরাতের তীরে একটি কুকুরও না খেয়ে মারা গেলে আমাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।'

'The 100' পুস্তকে হযরত উমর (রাঃ)-কে ৫২তম স্থান দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো 'Umar's brilliant leadership' অর্থাৎ হযরত উমর (রাঃ)-এর অতি উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় নেতৃত্ব।

হাতেও মারবো ভাতেও মারবো ঃ

কুরাইশরা দেখল মুসলমানদেরকে মারামারি খুনাখুনী দ্বারা ইসলামের অগ্রগতি রোধ করা যাচ্ছে না। তখন উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য এক ভয়াবহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। সভা করে তারা হাশেমী ও আবূ তালিবের গোত্রকে সর্বাত্মক সামাজিক বয়কটের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো। এই মর্মে চুক্তিপত্র লিখিত ও গৃহীত হলো যে, কেউ হাশেমী গোত্রের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক লেন-দেন, বৈবাহিক সম্পর্ক

স্থাপন অথবা অন্য কোনভাবে সাহায্য সহায়তা করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত হাশেমী গোত্র মুহাম্মদ (সঃ)-কে কুরাইশদের হাতে তুলে না দেয়।

আবূ তালিব তাদের এ দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে আবূ তালিব পরিবার-পরিজন ও স্বীয় গোত্রের লোকজনসহ পবিত্র উপত্যকা শে'বে আবী তালিবে আশ্রয় নিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই খাদ্য-সামগ্রী সব ফুরিয়ে গেলো। বিরোধীদের কড়া পাহাড়ার কারণে বাইরের থেকে খাদ্য পাওয়ার পথও রুদ্ধ ছিলো। এ অবস্থায় শিশু-কিশোরদের আত্ম-চীৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠলো আর তা দূরে দাঁড়ানো কুরাইশদের আনন্দ ও অট্টহাসির উৎসে পরিণত হলো। প্রায় দীর্ঘ তিন বৎসর কাল এই অমানবীয় অসহনীয় পরিস্থিতি চলতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মান্ধতা যে এমন স্তরে পৌঁছুতে পারে তা ভুক্তভোগিই মাত্র উপলব্ধি করতে পারে। বর্তমান যুগেও ধর্মান্ধতা থেমে নেই। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান মুসলমানরাও এই মহামারীতে ভয়াবহভাবে আক্রান্ত। এ অবস্থাতেও মুহাম্মদ (সঃ) অবিচলিত চিত্ত। এর রহস্য অনুধাবন করতে হলে কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে হুযূর (সঃ)-এর সম্পর্ক জানতে হবে, বুঝতে হবে। এজন্য কুরআনের দু'টো আয়াতের উদ্ধৃতি (বাংলা তর্জমা) দেয়া হলো ঃ

'হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ধৈর্য ও প্রার্থনা যোগে সাহায্য চাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন (২ঃ১৫৪) এবং আমি নিশ্চয়ই কতক ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কতক ধন, প্রাণ ও ফলের লোকসান দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিব। এবং সেই সহিষ্ণুদের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও যাহাদের উপর কোন বিপদ আসিলে তাহারা বলে, 'আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁহারই নিকটে ফিরিয়া যাইব' (২ঃ১৪৬-৫৭)।

'আলিফ-লাম-মিম, মানুষ কি মনে করিয়াছে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি বলিলেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে আর পরীক্ষা করা হইবে না ? এবং নিশ্চয়ই আমি সেই সকল লোকদেরও পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যাহারা তাহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে।'স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পাক কুরআনের প্রতিটি বাণী প্রতিটি আদেশ-নির্দেশের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। এজন্যই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন 'তোমরা কি কুরআন পড় নাই ? কুরআন-ই তো তাঁহার জীবন।'

কোন সমাজই পতনের চরম পর্যায়েও সম্পূর্ণভাবে সৎমানুষ-শূন্য হয় না। হিশাম ইবনে আমেরের নেতৃত্বে কিছু লোক এ অবস্থার অবসান ঘটাতে এগিয়ে এলেন এবং সকল প্রতিকুলতাকে অতিক্রম করে এই অন্তরীণ অবস্থা হতে সবাইকে মুক্ত করলেন।

তিন বৎসরের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিরূপ প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রিয়তম জীবন সাথী হযরত খদীজা (রাঃ) কিছু দিনের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করেন। মাসখানেক পর সকল বিপদ-আপদের অংশীদার আবূ তালিবও দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন (ইন্নালিল্লাহে...রাজিউন)।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া ঃ

বিশ্বাসীরা বয়কট মুক্ত হয়েছেন। কুরাইশ নেতারা তাতে মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। তারা এতে তাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতাই দেখতে পেলো। দীর্ঘ তিন বছর সমাজের লোকজনের সাথে উঠা-বসা করা, কথা-বার্তা বলার সুযোগ ছিল না, ফলে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হলো। ভাবের আদান-প্রদানে স্থবিরতা (Communication gap) সৃষ্টি হলো। হযরত খদীজা (রাঃ) ও আবূ তালিবের মৃত্যুতে ক্ষুদ্র মুসলিম জামাতে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হলো। এ সুযোগে বিরোধিরা তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। উচ্ছৃংখল যুবকদের ক্ষেপিয়ে তাদের দ্বারা হেরেম শরীফে, পথে-ঘাটে কাঁটা ছড়ায়ে, গালি-গালাজ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের স্বাদ মিটাতে থাকে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পরশি, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নানাভাবে অত্যাচারের পরিধি বাড়িয়ে দিলো। আল্লাহ্প্রদত্ত প্রাণ যার সেই মহানবী তো মুষড়ে পড়ার মত ব্যক্তিত্ব নন। দুঃখের দহন, ব্যথা-বেদনা তাঁকে সত্য প্রচারের মহান দায়িত্ব পালন হতে কখনও বিরত রাখতে পারে না। পরিবেশের প্রেক্ষিতে অনন্যোপায় সাহাবাদের মধ্যে কেউ কেউ শত্রুদের উপর আল্লাহ্র গযব কামনা করে দোয়া করতে পরামর্শ দেন। উত্তরে তিনি (সঃ) বলেছিলেন, "পূর্বে এমন অনেক নবী পৃথিবীতে এসেছিলেন, যাঁদের দেহ করাত দিয়ে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল, তবু তাঁরা নিজেদের কর্তব্য পালন করে গেছেন। তোমরাও দেখবে, ইসলাম পূর্ণ সফলতা লাভ করছে এবং এমন শান্তি স্থাপিত হবে যে, কোন উষ্ট্রারোহী সানা হতে হাজরামাউত পর্যন্ত নিঃশঙ্ক চিত্তে ভ্রমণ করতে পারবে এবং আল্লাহ্তাআলা ব্যতীত অন্য কাকেও তার ভয় করার থাকবে না।" নিজের বিশ্বাসে কি পরিমাণ আস্থা থাকলে এরূপ উক্তি করতে পারেন তা অনুধাবন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার! বস্তুতঃ এরূপ দৃঢ় মনোবলই রসূল করীম (সঃ)-কে মানব জীবনের শীর্ষে স্থান করে দিয়েছে। এ যুগের চরম অবক্ষয় হতে মানবতাকে মুক্ত করতে হলে বিশ্বনবীর মত মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় কি ? তা'ছাড়া মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করতে হলে আগে ঐ সত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে, পালন করতে হবে। (চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১২০৫৯৭, ৯১১৮৭৪৯

যিকরে হাবীব

দয়া করে একটু লক্ষ্য করুন

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌তাআলার সহিত সায়্যেদনা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কীরূপ সম্পর্ক ও মহব্বত এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করতেন উহার দৃষ্টান্ত নিম্নে বর্ণিত হলো। ইহা আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্যের মহান নিদর্শন। এই বিষয়ে সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন ঃ

কোন এক সময়ের ঘটনা, যখন একজন আরীয়া ইসলামের উপর আপত্তি জানিয়ে বললো যে, কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা কানুনে কুদরতের বিরোধী। সেই জন্য ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বলা হয়েছে যে, শত্রুরা যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করলো তখন খোদার হুকুমে তার উপর আগুন ঠান্ডা হয়ে গেল। এই বিষয়ে হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল)–আপত্তির জবাবে লিখলেন যে, আগুন প্রকৃত অর্থে আগুন নহে। বরং এখানে আগুনের অর্থ হচ্ছে, শত্রুদের দুষ্টামি। অনেকেই এই জবাব খুবই পসন্দ করলেন। কিন্তু এই জবাবের কথা যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জানতে পারলেন, তখন তিনি অত্যন্ত জোশের সহিত বল্‌লেন, এই জবাবের ব্যাখ্যা দান করা মৌলবী সাহেবের প্রয়োজন ছিল না। সেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগ তো শেষ হয়ে গেছে। এখন এই যুগে খোদার পক্ষ থেকে আমি বর্তমান আছি। আমাকে কোন শত্রু আগুনে নিক্ষেপ করে দেখুক না, খোদার ফযলে আমার উপরও আগুন ঠান্ডা হয়ে যাবে। *(সীরাতুল মাহদী রেওয়ায়াত নং ১৪৭, সীরাতে তাইয়্যেবা পৃঃ ১৫৪-১৫৬, বর্ণনা–হযরত মির্যা বশীর আহমদ)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-খোদাতাআলার সাহায্যের প্রতি এমন ভরসা রাখতেন যে, আগুনে পড়েও নিরাপদে ফিরে আসার দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন। অপর দিকে খোদার পথে প্রত্যেক কুরবানীর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন এবং তাঁর জন্য দুঃখ-কষ্ট বরণ করা আনন্দের মনে করতেন। হযরত মৌলবী আবদুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব বর্ণনা করেন যে, যখন হঠাৎ একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (সঃ)-এর (কাদিয়ানের) বাড়ীতে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট তল্লাশীর জন্য আগমন করলো, তখন আমাদের নানাজান মীর নাসের নওয়াব সাহেবের নিকট এই খবর পৌছলে তিনি খুব ভীত ও চিন্তাযুক্ত অবস্থায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট দ্রুত এসে বল্‌লেন, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হাত করাসহ ওয়ারেন্ট নিয়ে গ্রেফতার করতে আসছে। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর কিতাব নূরুল কুরআন লিখতে ছিলেন। মাথা তুলে মুচকি হেসে বল্‌লেন, মীর সাহেব ! দুনিয়ার আনন্দের জন্য মানুষ সোনা রূপার গহনা পরিধান করে থাকে, আর আমি না হয় আল্লাহ্‌র পথে লোহার গহনা পরবো। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লেন, না এমন হবে না। আমার খোদা এমন কর্ম থেকে মুক্ত রাখবেন *(মাসিক আনসারুল্লাহ্, মার্চ ১৯৯৫ সংখ্যা থেকে গৃহীত)*।

মেহমানদের প্রতি ভালবাসা ও উদার ব্যবহার

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব বর্ণনা করেন–

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বৃদ্ধদের প্রতি শুধু সম্মান প্রদর্শনের কথাই বলতেন না বরং সেই বিষয়ে শিক্ষাও দান করতেন। অর্থাৎ বাস্তবে তা করে দেখাতেন। অনেকবারই এমন হয়েছে যে, যখন মেহমান আসতেন তখন মেহমানদের অবস্থা ও চাহিদানুযায়ী খাবার পরিবেশন করতেন। ঋতু অনুযায়ী চা, ঘোল ইত্যাদি নিজ হাতে নিয়ে আসতেন এবং খাওয়াতেন। এমন কি কোন সংকোচ বোধ করতেন না। পীড়াপীড়ি করে পান করাতেন। কোন বন্ধু কাদিয়ানে নির্ধারিত দিন অবস্থান শেষ করে বিদায় কালে তাঁর সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত যেতেন এবং প্রয়োজনে সঙ্গে নাস্তাও নিয়ে আসতেন। কোন কোন সময় এমনও দেখা গেছে যে, তরবীয়তের জন্য হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মদ আহমদকে (যিনি তখন ছোট ছিলেন) উঠিয়ে সাথে নিয়ে আসতেন। সাধারণতঃ স্বীয় বক্তৃতায় মজলিসসমূহে বলতেন যে, আমি কষ্ট-কল্পনাকারীদের মধ্যে নই। আমাদের মেহমানদের মধ্যে যারা সংকোচ করে তাকে কষ্ট করতে হয়। সেই জন্য যার যা প্রয়োজন তা বলবেন। তিনি যখন বাইরে খানা খেতেন তখন সবার শেষে খাওয়া শেষ করতেন এবং খুব কম খেতেন। সবার শেষে খেয়ে উঠতেন এই জন্য যে, কোন কোন সময় নতুন মেহমান কোন কারণে বা লজ্জায় কম খেয়েই যেন না উঠে যান। সেই জন্য হযরত মেহমানদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত তুলতেন না।

একবার ঝিলাম থেকে আগত দুই ব্যক্তি (যারা খুবই বৃদ্ধ বয়সের ছিলেন) উপস্থিত হলেন, তখন তিনি ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। তারা চলতে পারছিলেন না। তাদেরকে দেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং অনেকক্ষণ কথা-বার্তা বল্‌লেন। যখন তারা কিছুটা স্থির হলেন তখন তিনি তাদেরকে খাবার খাওয়ানোর হুকুম দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ভ্রমণে চলে গেলেন।

একবার মোকদ্দমা উপলক্ষে হুযূর গুরুদাসপুর অবস্থান করছিলেন। বাবা হেদায়েত উল্লাহ সাহেব যিনি পাঞ্জাবী ভাষার প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি অনুমতি প্রার্থনা করেন। হুযূর বলেন, আপনি গিয়ে কি করবেন ? যদি কোন কষ্ট থাকে তা হলে বলেন, সেই ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব। তারপর তিনি জামাতকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, যেহেতু মানুষ অনেক হয় হয়তো কারো প্রয়োজন জানা না থাকতে পারে সেই জন্য প্রত্যেকের উচিত যার যা প্রয়োজন সে যেন নিঃসংকোচে বলে দেয়। আর যদি কেউ জেনে মনে গোপন করেন তা হলে তিনি গোনাহ্‌গার হবেন। আমাদের জামাতের নিয়মই হচ্ছে যে, নিঃসংকোচ এবং কষ্ট-কল্পনামুক্ত জীবন যাত্রা। বাবা হেদায়েতুল্লাহ্ সাহেবকে মৌলবী সৈয়দ সারওয়ার শাহ্ সাহেবের নিকট ন্যস্ত করে দিলেন, তিনি যেন তার প্রয়োজন এবং আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখেন *(আল্ হাকাম, কাদিয়ান, নং-৬–৭, জিলদ-৪১৩)*।

তিনি তো গণী (অভাবমুক্ত)

ঠিকাদার মোহতরম আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব (মির্যা মুহাম্মদ বাটালভী সাহেবের বড় ভাই) বলেন, আমি যখন হিজরত করে কাদিয়ানে চলে আসি, তখন এখানে এসে কাঠের ব্যবসা শুরু করি। একবার মিনারের জন্য ইটের ভাটাতে ব্যবহারের জন্য কাঠের প্রয়োজন দেখা দেয়। হযরত সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, আপনি কিছু কাঠ দিবেন। আমি বল্‌লাম, কী পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন ? তিনি বল্‌লেন, ইটের জন্য কিছু এবং কতক চারপাই বানানোর জন্য প্রয়োজন। আমার কাছে বট-পাঁকুড় বৃক্ষের কাঠ ছিল। আমি বল্‌লাম, বটের কাঠ আছে। ইতোমধ্যে একবন্ধু বল্‌লেন, বট কাঠের পায়া ফেটে যায়। (হযরত আকদস) বল্‌লেন, কোন আপত্তি নেই। দুনিয়ার সব কিছুই নশ্বর। মোট কথা, পায়া তৈরী করে হযরত সাহেবের খেদমতে পেশ করলাম। তারপর আমি আরজ করলাম, কিছু টাকার প্রয়োজন। হুযূর বললেন, ভাল কথা। একটি রুমালে বাঁধা কিছু টাকা ছিল। হযরত সাহেব নিয়ে বাইরে আসেন এবং আমার সম্মুখে রেখে দেন এবং বলেন, তোমার যা প্রয়োজন তা নিয়ে নাও। আমি আমার প্রয়োজনানুসারে নিয়ে নিলাম এবং বল্‌লাম, নিয়ে নিলাম। ভাটির জন্য। কটস্থ এক গ্রাম থেকে কাঠ নিয়ে আসলাম। যখন কাঠের কথা আলোচনা চলছিল, তখন মীর নাসের নওয়াব সাহেব বললেন, অনেক টাকা ব্যয় হবে। তখন হযরত আকদস বললেন, যার জন্য কাঠের প্রয়োজন তিনি দরিদ্র নন, তিনি তো গনী *(আল্ হাকাম জিলদ ৩৯ নং-৩/২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬, মাসিক আনসারুল্লাহ ১৯৯৪ সনের মার্চ সংখ্যা থেকে গৃহীত)*।

সংগ্রহ ও অনুবাদ– ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ

আচ্ছা কাহানীয়াঁ

(ভাল ভাল গল্প)

(মূল-বুশরা কুরায়েশী)

(করাচী জিলা লাজনা ইমাইল্লাহ্ থেকে শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ও ওয়াকফে নও পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত)

দু'টি কথা

আল্লাহ্তাআলার আশিস ও করুণায় করাচী জিলা লাজনা ইমাইল্লাহ্ শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা উৎসব উপলক্ষ্যে এ পুস্তকখানা প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। লাজনা ইমাইল্লাহ্, করাচী এ সৌভাগ্যও লাভ করছে যে, তারা না কেবল বড়দের জন্যে বরং কচি কচি শিশুদের জন্যেও সহজ ভাষায় পুস্তকাদি উপস্থাপন করছে। এসব পুস্তকের গ্রহণীয়তা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে, শিশুদের এ পুস্তকগুলোর খুবই প্রয়োজন ছিলো। পাঠ্য পুস্তক ও পবিত্র জীবনীর ওপর পুস্তক প্রণয়নের সাথে সাথে এখন গল্পের আকারে সাদা মাটাভাবে হৃদয়গ্রাহী তরবীয়তী-বিষয় শেখানো হচ্ছে। এ পুস্তকখানার নাম দৃষ্টে তা মনে হচ্ছে। এতে ভাল ভাল গল্প সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফুল-তুল্য শিশুদের মাথায় শিশির কণার ন্যায় বিশোষিত হয়ে ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণের লক্ষ্যে এ ধারণা বৃহৎ কর্মকান্ডের রূপ পরিগ্রহ করবে।

খোদা করুন, শিশুরা এ ভাল ভাল গল্প থেকে যেন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের অনুগ্রহশীলা বুশরা কুরায়েশী সাহেবাকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখে। তিনি এ গল্পগুলো রচনা করেছেন। এতদ্ব্যতিরেকে ইশায়াত বিভাগের টিমের প্রিয় আমাতুল বারী নাসের সাহেবা, প্রিয় বরকত নাসের সাহেবা, প্রিয় শাহনায নঈম সাহেবা এবং অন্যান্য সহায়তাকারিণী যাদের পরিশ্রমে পুস্তক খানা এ রূপ ধারণ করেছে, দোয়ার মধ্যে স্মরণ রাখবে। আল্লাহ্তাআলা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং স্বীয় সন্তুষ্টির জান্নাতের উত্তরাধিকারী করুন। তথাস্তু পুনঃ তথাস্তু।

সলীমা মীর

সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্, করাচী

ময়নার ঈদ পালন

ঈদের দিন যতই এগিয়ে আসছিলো ময়নার ফুলের মত মুখখানা শুকিয়ে যাচ্ছিলো। তার উজ্জ্বল চোখের চমক কমে যাচ্ছিল। গাল দু'টোতে দুঃখ-বেদনার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। এমন মনে হচ্ছিলো যে, কেউ যেন গোলাপ সদৃশ মুখের ঔজ্জ্বল্যকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

এখন সে নিজের পুতুলগুলোকে সামনে রেখে চিন্তা করছে। সে পুতুলগুলোকে বল্লো, "হে পুতুলেরা ! তোমরা কি জানো যে, লায়লা ঈদের জন্যে সোনালী পাড়যুক্ত ঢোলা পাজামা সেলাই করে আনিয়েছে ? কাল যখন আমি তার ওখানে গিয়েছিলাম তখন সে আমাকে দেখিয়েছিলো। ওহ! কি ভালই না লাগছিলো! তার আম্মু তার জন্যে মানানসই জুতোও কিনে এনেছেন। চুড়িও এনেছেন। আর জানো কি ফুলের সালোয়ার স্যুট তো লিরার ঢোলা পাজামার থেকেও অধিক সুন্দর। সে আমাকে পরিধান করে দেখিয়েছে। ফিরেজা রং এর সালোয়ার। এতে সোনালী মুক্তার ঝালর। শাহযাদীর মত দেখাচ্ছিল। তার আর আমার বান্ধবী তুবার গোলাপী ফ্রক এর সাথে চুরিদার পাজামাও আছে। তার আম্মু তার জন্যে চুমকিযুক্ত ঘাগড়া এনেছেন। এজন্যে যে, ফ্রকের গলায় শুভ্র মতির কাজ করা আছে। এজন্যে তিনি এর সাথে সাদা মুণি-মুক্তাও এনেছেন।

শুভ্র মতির হার, কানের দুল, সাদা চুড়ি। দাদী আম্মা না যেসব পরীদের গল্প শুনিয়েছেন, গুলের কাপড় অবিকল ঐসব পরীদের মত! আর লিরার স্যুট, তার সম্বন্ধে জান কি, কেমন ? এর ওপরে বুটির কাজ আছে। উহাও দেখতে খুবই সুন্দর ! কিন্তু আমাকে তো আম্মু এবার কাপড় কিনেই দেন নি।" একথা বলতে বলতে ময়নার গলা ভারী হয়ে আসলো!

"কাল আম্মু আব্বুর সাথে বলছিলেন, এবার আমরা ঈদের সময়ে কাপড় তৈরী করবো না। কেননা, সামর্থ্য নেই। জান কি, কেন? আম্মু আর আব্বু একটি খুব ভাল কাজ করেছেন। আমাদের পাড়ায় এক আপা আছে না ! ইনি পাড়ার সব শিশুদের কায়দা পড়িয়ে থাকেন। তার বিয়ের সব কাপড় ও অলংকার আম্মু তৈরী করেছেন। আপুর আব্বু তো নেই ! এজন্যেই তো আব্বু আম্মু সব খরচ বহন করেছেন। আম্মু বলছিলেন, নিজেদের খরচ কম করে লোকদের সাহায্য করা খুবই বড় পুণ্যের কাজ"।

দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তার আম্মু সবই শুনছিলেন। ময়না একমাত্র কন্যা ছিলো। তিন ভাইয়ের আহ্লাদী বোন। মা-বাবার চোখের মণি! কিন্তু এত আদর-সোহাগ পাওয়ার পরও ময়না খুবই ভদ্র। ময়নার আম্মুও খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। রাত্রে যখন সবাই বিছানায় ঘুমিয়ে গেলো তখন ময়না তার আম্মুকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"আম্মু মণি ! আমি ঈদে আমার পুরনো কাপড়গুলোর মধ্য থেকে কোন্ স্যুটটি পরবো" ?

আম্মু বল্লেন, "সোনা আমার ! ভাল ও পুণ্যবান শিশু যা কিছুই পরুক না কেন তার আসল সৌন্দর্য তো তার উত্তম আচরণ।"

বেশ, আমাকে একথা তো বলো যে, আমাদের এ ঈদের কি নাম?"ঈদুল আযহা," ময়না ঝটপট্ করে জবাব দিলো। "ইহাকে কুরবানীর ঈদও বলা হয়ে থাকে।"

"শাব্বাশ", আম্মু বল্লেন। আচ্ছা ইহাকে কুরবানীর ঈদ কেন বলে ? ইহা কোন্ কুরবানীর স্মরণে পালন করা হয় ?

"এ ঈদ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কুরবানীর স্মরণে পালন করা হয়। তিনি স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে খোদাতাআলার আদেশে কুরবানী করার জন্যে সংকল্প করেছিলেন"। ময়নার ইসলামীয়ত পুস্তক থেকে মুখস্ত করা উত্তর মনে ছিলো।

"এতদ্ব্যতিরেকেও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আরও একটি পরীক্ষা নেয়া হয়েছিলো," তার আম্মু বল্লেন। "উহা কী ছিলো আম্মু", এ প্রসঙ্গে কিছু বলুন না ?" ময়না উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলো।

"সোনা মণি ! উহা ছিলো এই যে, আল্লাহ্তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বল্লেন, তুমি তোমার স্ত্রী ও সন্তানকে এমন

একটি স্থানে পরিত্যাগ করে এসো যা জন-মানবহীন জঙ্গল। সুতরাং তিনি এ দুজনকেই জন-মানবহীন জঙ্গলে ছেড়ে আসেন। সেখানে না তো পানি ছিলো আর না ধারে কাছেও কোন জীব-জন্তুর অস্তিত্ব ছিলো। তাঁর পবিত্র স্ত্রী হযরত হাজেরা ছিলেন ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞতাপরায়ণা মহিলা। তিনি খোদাতাআলার আদেশের নিকট আনুগত্য করার প্রমাণ দিলেন। আল্লাহ্‌তাআলার নিকট তাঁর এসব পবিত্র বান্দাদের কুরবানী খুবই পসন্দ হলো। এ কুরবানীর স্মৃতিকে তাজা রাখার জন্যে প্রত্যেক বছর ঈদুল আযহিয়া পালন করা হয়ে থাকে।

তুমি তো জানো যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে খলীলুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বন্ধু উপাধি দেয়া হয়েছে। খোদাতাআলা তাঁকে যে পরীক্ষায়ই নিপতিত করেছেন তিনি (আঃ) সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে কাজ করেছেন। মুখে উঃ পর্যন্ত বলেন নি। কোন প্রকারের অভিযোগ উত্থাপন করেন নি। ইহাও চিন্তা করেন নি যে, স্ত্রী নিষ্পাপ, শিশুর জীবন কীভাবে রক্ষা পাবে। সেখানে পানিও ছিলো না আর খাবারও কিছু ছিলো না। আর এই মা ও পুত্রকে দেখার জন্যে জঙ্গলপূর্ণ মরুতে কোন মানবও ছিলো না। আল্লাহ্‌তাআলা তো তাঁর বান্দার নিকট থেকে শুধু পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। আবার তিনি স্বীয় ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতাপরায়ণ বান্দাদের জন্যে, যাদের তিনি পুরস্কারের অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন, একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে যাচ্ছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর এ কুরবানীকে আল্লাহ্‌তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত লোকদের জন্যে একটি পথের আলোক-বর্তিকা করেছিলেন। যে লোকই খোদাতাআলার পক্ষ থেকে আগত পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের ওপরে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকে তাদের জন্যে পৃথিবীতেও এবং পরকালেও অসংখ্য কল্যাণরাজি রয়েছে। তাদের জন্যে বেহেশ্‌তের শুভ সংবাদ রয়েছে এবং অনেক আনন্দের সংবাদও। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আর তাঁর পুত্র কতই না মহান ছিলেন!"

ময়না খুবই মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনছিলো। আম্মু বলতে লাগলেন, "খোদাতাআলা এসব কল্যাণরাজিকে লাভ করার পথসমূহকে বন্ধ করেন নি বরং পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে এ দোয়া শিখিয়েছেন ঃ

"আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো ঐ পথে যেপথে চল্লে তোমার পুরস্কার ও কল্যাণরাজি অবতীর্ণ হয়" (সূরা ফাতিহা)।

সুতরাং কল্যাণরাজি ইহাই যা এসব নবীগণের (আঃ) ওপরে খোদা কর্তৃক বর্ষিত হয়েছে। আজ আমরাও ঐসব নবীগণের (আঃ) পথে পদচারণা করে, এসব কল্যাণরাজির অধিকারী হতে পারি।

শহীদের মধ্যে হযরত ইমাম হুসায়েন (আঃ)-এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রয়েছে যে, তিনি খুবই ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে এবং নেহায়েৎ সাহসিকতার সাথে শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু ইসলামের ওপরে আচঁড় লাগতে দেন নি।

এভাবে আহমদীয়া জামাতের একজন সাহসী বুযর্গ হলেন সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রাঃ)। তিনি যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বয়াত হলেন তখন বাদশাহ্ ও তার দেশবাসী খুবই নির্দয়ভাবে তাঁকে শহীদ করে দেয়"।

ময়না বল্লো, "কিন্তু আম্মু, হযরত ইমাম হুসায়েন (আঃ) ও সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব তো নবী ছিলেন না।"

"নিঃসন্দেহে নবী ছিলেন না, কিন্তু নবীদের অনুসরণকারীতো ছিলেন ? এজন্যে আনুগত্যের পরম পরাকাষ্ঠা তো তাঁরা দেখিয়েছিলেন", আম্মু বল্লেন।

"আবার খোদাতাআলা নবীদের (আঃ) মাধ্যমে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়েছেন। আমাদের প্রিয় প্রভু নবীদের নেতা (সঃ) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সর্বাধিক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন। এমন কি এমন একটি সময়ও এসেছিলো যে, দু'জগতের নেতা এবং তাঁর (সঃ) সঙ্গীগণকে শে'বে আবী তালিবে অবরুদ্ধ করে দেয়া হলো। তাঁর (সঃ) সাথীদের অবস্থা তো এই ছিলো যে, ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু মুখে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেন নি। নিজের উম্মতের কল্যাণের জন্যে দোয়ায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর (সঃ) উম্মতের লোকদিগকেও আল্লাহ্‌তাআলা পরীক্ষায় নিপতিত করেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকেও আজ পরীক্ষা করছেন। বলতো কীভাবে ? আমরা প্রত্যেক ঈদে কোথা থেকে নতুন নতুন কাপড়, জুতো ভাল ভাল খাবারের কল্যাণরাশি নিয়ে আসি ? খোদা দিয়ে থাকেন, তাই না?

যদি এই ঈদে আমরা কেবল এজন্যে যে, আমরা তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে সামান্য কুরবানী করি। কাপড়-চোপড় না তৈরী করতে পারি, তাহলে কী হলো। তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে অন্যান্য পুণ্যের কাজ আমরা যা করেছি সম্ভবতঃ তা যদি গ্রহণীয় হয়ে যায়! এ সামান্য কুরবানী, আমাদের নিজেদের অন্যান্য স্বল্প সামর্থ্যবান ভাই-বোনদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যাদের কয়েকটি ঈদই এমনিতেই কেটে যায়।"

"আম্মু, তাহলে ইহাও কি একটা পরীক্ষা"? "হ্যাঁ, আমার সোনামণি, এই প্রথম ঈদ যাতে তুমি নতুন কাপড় তৈরী করাও নি। হযরত হাজেরা ও তাঁর পুত্রের তুলনায় কিছুটা হলেও কষ্টে-সৃষ্টে এ কুরবানী করো। পরে তুমি বুঝতে পারবে যে, এতে কোন কষ্টই নেই। অন্ধকার রাত্র। উষ্ণ মরুভূমি। সহায় সম্বলহীন মা ও পুত্র ! অথচ তুমি তো ঘরে আছো। মা-বাবা আছেন। ভাই আছে। প্রত্যেক প্রকারের নেয়ামত ও কল্যাণ মজুদ আছে।"

"হ্যা, সবই তো আছে আম্মু", ময়না লজ্জা পেয়ে বল্‌লো'।

"তুমি ঐ রাজার কথা শুনো নি ! তাঁর খুবই এক বিশ্বস্ত দাস ছিলো। রাজা একবার তেতো তরমুজ কেটে সভাসদদের দিলেন। সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলো; কিন্তু বিশ্বস্ত দাস এমন খারাপ ফলও মজা করে খেতে লাগলো। সারাটা দরবারের লোক বিস্মিত হলো! এমন তেতো ফল এ দাস কীভাবে খাচ্ছে ? রাজা কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জান কি দাস কী জবাব দিলো ?

"হুযূর ! আপনার হাত দিয়ে কতই না কল্যাণ লাভ করে থাকি। যদি ঐ হাত থেকে আজ সামান্য তরমুজ পেয়ে অকৃতজ্ঞতা করি কীভাবে ?

দেখ, সোনা আমার ! সে ছিলো সামান্য একজন দাস; কিন্তু আমাদের ও আমাদের প্রভুর ব্যাপারটি তো এর চেয়ে অনেক গুণ বিশ্বস্ততার প্রত্যাশী। আমাদের প্রভু-প্রতিপালক তো না

চাইতেই অনেক কল্যাণ দান করেছেন, আমরা যেগুলোর অধিকারীও নই। আজ যদি তার নিকট থেকে কিছু দুঃখ-কষ্ট আপতিত হয় তাহলে তাতে কী আসে যায়। ঐ আল্লাহ্ খুবই স্নেহ করেন, তিনি অবশ্যই দিবেন এবং অনেক দিবেন," আম্মু বল্লেন।

"আম্মু! আপনি ঠিকই বলেছেন। এ ঈদে আমি কাপড় না বানালে কী হবে ? আপুর বিয়ের তো খুবই প্রয়োজন ছিলো যার ব্যবস্থা করার সৌভাগ্য আপনার ও আব্বুর হয়েছে"।

আমি এ ঈদে পুরনো ঢোলা পাজামাটিই পড়ে নিবো আর একবারই তো মাত্র ওটা পরেছি। এখনও নতুনই রয়েছে"।

ময়না ছিলো ওয়াকফে নও শিশু। পুণ্য স্বভাবের। তার ওপরে এসব ভাল ভাল কথায় খুব প্রভাব সৃষ্টি হলো। "এখন আমি কখনও ছোট ছোট বিষয় নিয়ে কান্নাকাটি করবো না"–সে আম্মুর গলা ধরে বল্লো।

তার ক্লাসের বান্ধবী মৌসুমীর কথা মনে হলো। সারা বছর সে কেবল একটি মাত্র প্রস্থ পোষাকই তৈরী করতো। কিন্তু সে এতে কখনও কিছু মনে করতো না অথচ লেখা-পড়ায় সবার আগে ছিলো। চিন্তা করতে করতে কখন না জানি ময়না ঘুমের পুরীতে পৌছে গেলো!

দ্বিতীয় দিন তার আম্মু তাকে বাজার থেকে খুব সুন্দর দেখে চুড়ি এনে দিলেন। রাত্রে যখন ময়না মেহদী মাখতে বসলো তখন সাকিব ভাই হাসি মুখে ঘরে এসে প্রবেশ করলো। মামা, মামা এসেছেন"

এবার সবাই একত্রিত হয়ে ধ্বনি দিয়ে উঠলো, "মামা এসেছেন।"

ঈদের একদিন পূর্বে মামার আসার আনন্দ ঈদের আনন্দের চেয়ে কম ছিলো না। সারাটা ঘরের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে গেলো। মামা সউদী আরব থেকে ঈদ করার জন্যে নিজের বোনের বাড়ী এসেছেন।

রাত্রে তিনি সকলকে উপহার দেয়ার জন্যে ব্যাগ খুল্লে ময়নার চোখ আনন্দে ছানা বড়া হলো! সাদা ফ্রক যার ওপরে চুমকি লাগানো ছিলো এবং সাদা মুক্তোও লাগানো ছিলো, তা ময়নাকে দিলেন। ফ্রকের নানা প্রকার রঙ্গের ফিতায় আশ্চর্য বসন্তের সমারোহ দেখা দিলো, সাদা চুমকি মুক্তোর মত জ্বল জ্বল করছিলো।

"এ কি স্বপ্ন"

সে নিজে নিজে আওড়ালো। বার বার ফ্রক স্পর্শ করলো। স্বপ্নকে বাস্তবে উপলব্ধি করে ময়নার আনন্দের সীমা থাকলো না।

পরের দিন ছিলো ঈদ। নতুন ফ্রক ও সাথে সিল্কের পাজামা পরিধান করে ময়না নামায পড়তে গেলো। ময়না আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহের শোকরিয়া আদায় করলো তিনি কীভাবে তাঁর নিষ্পাপ দাসীকে তার পুণ্যের পুরস্কার দিলেন!

আনন্দের পুষ্প তার চারদিকে নাচতে ছিলো, আর সে একটি প্রজাপতির ন্যায় স্বীয় বান্ধবীদের সমাবেশে নিজেকে বায়ু হিল্লোলে উড্ডীয়মান মনে করছিলো। (চলবে)

অনুবাদ ঃ **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

নিরাশ হইও নারে আল্লাহ্র দরগায়!

যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) বলেনঃ

" ইহা ভাবিও না যে, 'আমরা পাপী আমাদের দোয়া কীরূপে গৃহীত হইবে। মানুষ ভুল করে ঠিকই কিন্তু দোয়ার মাধ্যমে পরিশেষে আত্মার উপর সে বিজয় লাভ করে এবং আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া ফেলে। কেননা, আল্লাহ্তাআলা মানুষের মাঝে সম্ভবতঃ এই শক্তিও দান করিয়াছেন যে, সে স্বীয় আত্মার উপর জয় লাভ করিতে পারে। তোমরা লক্ষ্য কর, পানির স্বভাবে এই বৈশিষ্ট্য দান করা হইয়াছে যে, উহা আগুনকে নির্বাপিত করে। পানিকে যতই উত্তপ্ত কর এমন কি উত্তপ্ত করিতে করিতে আগুনের ন্যায় উষ্ণ করিয়া ফেল তথাপি উহা আগুনের উপর পড়িলে অবশ্যই আগুনকে নিভাইয়া দিবে। পানির স্বভাবে যেরূপ শীতলতা রহিয়াছে মানুষের স্বভাবে তদ্রূপ পবিত্রতা বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষের স্বভাবে আল্লাহ্তাআলা পবিত্রতার বীজ রাখিয়া দিয়াছেন। এই কথা ভাবিয়া ঘাবড়াইও না যে, 'আমরা পাপে জর্জরিত'। পাপের উদাহরণ সেই ময়লার ন্যায় যাহা কাপড়ে লাগিয়া থাকে, কিন্তু উহা দূরীভূত করা সম্ভব। তোমাদের স্বভাব যতই আত্মার কুপ্রবৃত্তির অধীনস্থ হইয়া গিয়া থাকুক না কেন আল্লাহ্তাআলার কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে থাকো। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে ব্যর্থ ও বিনষ্ট করিবেন না। তিনি পরম সহনশীল, তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়।" (১৭ই জানুয়ারী, ১৯০৭ইং তারিখের বদর পত্রিকার সৌজন্যে)।

বর্তমান সময়ে দোয়ার জন্যে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপত্র

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) গত ১২ই মার্চ '৯৯ জুমুয়ার খুতবায় দুরূদ শরীফের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে বর্তমান সংকটপূর্ণ দিনগুলোতে ঐশী করুণা আকর্ষণের জন্যে একটি ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ করেছেন। তিনি (আইঃ) বলেছেন, যারা রীতিমত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে অপারগ তারা যদি 'ইশার নামাযের পরে দু'রাকাআত নফল নামায (কাযায়ে হাজত) পড়ে ১০০/২০০ বার ইস্তিগফার এবং ১০০/২০০ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে দোয়া করেন তাহলে তাদের দোয়া আল্লাহ্তাআলার নিকট কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আহমদী ভাই ও বোনদের এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবলীগের প্রতি বিশেষ জোর এবং এর সফলতার জন্যে দোয়ার অনুরোধ করছি।

সেক্রেটারী তবলীগ

সত্যের অপলাপ

মদীনা ভবন, বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক মদীনা পত্রিকার মার্চ ৯৯ সংখ্যায় "আপনাদের কথা" কলামে সৈয়দ আলী আহসান নামক জৈনক ভি, সি, আহমদী মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে "আহমদী সম্প্রদায় : আমার বক্তব্য" নামে একটি মন্তব্য লিখেছেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা। তিনি দারুল এহসান নামক বিশ্ব বিদ্যালয়ের একজন ভি. সি.। তাঁর বক্তব্যে মনে হচ্ছে সত্যের অপলাপে তিনি খুবই পারদর্শী। তিনি প্রথমেই লিখেছেন, "আমি পাকিস্তান আমল থেকেই কাদিয়ানীদের কার্যকলাপের সংঙ্গে পরিচিত"। ভি. সি. সাহেব সম্ভবতঃ ঘুমের ঘোরে অচেতন অবস্থায় আহমদী জামাতের কার্যকলাপের সাথে পরিচিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলার ভয় হৃদয়ে রেখে আঁখি খুলে একবার তাকিয়ে দেখুন আহমদী জামাত কর্তৃক সমগ্র বিশ্বব্যাপী হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর আদর্শ শিক্ষা ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ অমুসলমানকে মুসলমান বানানো, এবং খোদার ঘর-শত শত মসজিদ প্রতিষ্ঠা, মানুষের সেবায় স্কুল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের কার্যাবলী। ভি. সি. সাহেব রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেহেশ্‌তে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর। আমি প্রবন্ধকে দীর্ঘায়িত করব না। কেননা, ভি. সি সাহেবদের আহ্‌মদী জামাতের বিরুদ্ধে এই সকল উক্তি নতুন কিছুই নয়। আহ্‌মদী জামাত বহুবার এই সকল মিথ্যা ভাওতাবাজীর উত্তর দিয়েছেন। আমি ভি. সি. সাহেবকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি। আশা করি ভি. সি. সাহেব আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন।

আল্লাহ্‌তাআলা সূরা ফাতিহায় মুসলমানদেরকে 'মগযুব' বা ইহুদীদের দশা থেকে বাঁচবার জন্য দোয়া শিক্ষা দেওয়ার তাৎপর্য কি? এবং কি কারণে ইহুদীগণ অভিশপ্ত হলেন? "যুগ ইমামের হাতে বয়াত না করে মৃত্যু লাভ করলে জাহেলিয়তের অবস্থায় মৃত্যু লাভ হয়"- আশা করি ভি.সি সাহেবের ন্যায় একজন উচ্চ ডিগ্রীধারী পদস্থ লোকের পক্ষে অজানা থাকার কথা নয়। প্রশ্ন এই যে, বর্তমান যুগে মুসলিম জাতীর ইমাম কে এবং তিনি কোথায়? তবে তিনি কী মসজিদের ইমাম বা কোন উচ্চ ডিগ্রীধারী বিখ্যাত মাওলানা বা কোন পীর সাহেব ? বরং প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তিনিই যুগ-ইমাম হতে পারেন যাঁকে আল্লাহ্‌তাআলা নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মানব জাতির পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁকে গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যে তাঁকে গ্রহণ করে না সে উপরোক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত নয় কি? আমি বর্তমান যুগ সম্পর্কে মাসিক মদীনা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে মূল বিষয়ে যাচ্ছি।

"বর্তমানে পৃথিবীতে পরিপূর্ণভাবে জাহেলিয়তের অন্ধকার যুগ চলছে" (মাসিক মদীনা ১০ পৃঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯)। "আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া মোমেন মোত্তাকী শাসক ও খেলাফত ছাড়া তাদের মুক্তি আসবে না। অনেক আলেম ও ইসলাম পন্থী দল জাহেলিয়াতের প্রভাবে তৌহিদ শিরক এক করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আনন্দোলন করে কুফরী তথা গণতন্ত্র কে বৈধতা দিচ্ছে" (মাসিক মদীনা ১৩ পৃঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯)।

প্রশ্ন এই যে, মুসলমান জাতির খলীফা কোথায়? ভি. সি. সাহেবরা তাঁর খবর রাখেন কি? খিলাফতে অবিশ্বাস, অগ্রাহ্য, উপেক্ষা ও অস্বীকার করার কারণেই মুসলমান জাতির ললাটে নেমে এসেছে অন্ধকারের ঘনঘটা।

"কোরআনের হুকুম ও সুন্নাহ্‌র সুকঠিন নিয়ম পদ্ধতি বাদ দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে বেহেশ্‌ত পাওয়ার জাহেলী রূপ দুর্বল ঈমানদারকে আকৃষ্ট করে বেশী। আয় রোজগারের হারাম পথ রুদ্ধ না করেই এক শ্রেণীর দোয়া বিক্রির দোকানী নিজেদের আল্লাহ্‌র অলী ঘোষণা দিয়ে হারাম রোজগারীদের বড়লোক হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার সাথে বেহেশতের পথ বাত্‌লে দেয়। আল্লাহ্ সতর্ক করে বলেন, আল্লাহ্ বন্ধু পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন ঈমানদার লোকদের। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন। আর কাফেরদের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে আল্লাহ্‌দ্রোহী সীমালঙ্ঘনকারী লোকেরা। তারাই তাদের বের করে আনে আলো থেকে পঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে। (বাকারা- ২৫৭) নব্য জাহেলিয়াতের অভিনব কিছু উপশিরা মারাত্মকভাবে ঈমানের মূল প্রবাহে বিষক্রিয়া ছড়াচ্ছে। তা হল - নফল, মুস্তাহাব কিছু এবাদতকে ফরজতুল্য মনে করা। শুধু তাই নয় ফরজ প্রতিষ্ঠার জন্য নূন্যতম প্রচেষ্টা যেখানে অনুপস্থিত সেই সব নফল মুস্তাহাব প্রতিষ্ঠায় রীতিমত তারা জেহাদ ঘোষণা করছে। ফলে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে দেখা দেয় অনৈক্য ও প্রতিহিংসা। এ কি আশ্চার্যজনক কীর্তিকলাপ নয়"? (মাসিক মদীনা পৃঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯)। "বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্বের সংকট অত্যন্ত চরম আকার ধারণ করেছে। এক কথায় বলতে গেলে মুসলিম বিশ্ব আজ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছে। এমন কোন নেতা বা নেতৃত্ব নেই যা বিশ্ব প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। ফলে মুসলিম বিশ্বের জন্য সৃষ্টি হয়েছে চরম সংকট। ধনবল, জনবল ও ভৌগলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থেকেও তারা আজ নির্যাতিত নিষ্পেষিত একটি উদ্বাস্তু জাতির মত ঘুর পাক কাচ্ছে" (মাসিক মদীনা পৃঃ ১২ মার্চ, ১৯৯৯)।

"সহীহ হাদীসের একাধিক বর্ণনায় এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে যে, আখেরী জামানার এক পর্যায়ে মুসলমানদের অবস্থা যখন নানা কারণে খুবই শোচনীয় হয়ে পড়বে, তখন তাদের মধ্যে এমন একজন আদর্শ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম উম্মাহ্ তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে এবং দুনিয়াতে নতুন করে শান্তি ফিরে আসবে। এই নেতৃত্ব পূরুষকেই "আল্ ইমাম আল্ মাহদী" বলে অভিহিত করা হবে। যার সরল অর্থ হচ্ছে আদর্শ নেতা। এই আদর্শ নেতা বা ইমাম আল মাহদীর আসল নাম কি হবে সে সম্পর্কে হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নাই। কোন কোন দুর্বল বর্ণনায় তাঁর নাম বলা হয়েছে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্" (মাসিক মদীনা পৃঃ৫১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯)। "ইমাম মাহ্‌দীকে আল্লাহ্‌তাআলা পাঠাবেন সত্যিকার ইসলাম কি তা জানাতে যাতে এই উম্মত তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত না থাকে। তিনি মানুষের চরিত্র সংশোধন করবেন। মিথ্যা ধ্বংস করে সত্য প্রতিষ্ঠিত করবেন" (মাসিক মদীনা পৃষ্ঠা ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯)।

মুসলমান জাতি যে আজ বহুধা বিভক্ত, নাই কোন নেতা, নাই একতা, নাই ভ্রাতৃত্ব, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই একথা শুধু যে কেতাবেই লিখিত আছে, এ বিষয়ে আর ব্যাখা করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন রাখে না। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। এবং তার মাধ্যমে মুসলমান জাতির মধ্যে পুনরায় নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আহমদীয়া জামাত নামে এক সংগঠন স্থাপন করতঃ মিথ্যা বেদাত, শিরক ইত্যাদি অধর্মীয় ক্রীয়াকলাপ মিটিয়ে দেওয়ার কাজে রত হয়ে যখন শতধা বিভক্ত মুসলমান জাতিকে ঐক্যের ডাক দিলেন, তখনই ধর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে ভি.সি. সাহেবগণ নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ

ছড়িয়ে জনসাধারণকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে হলেন লিপ্ত। এমন কোন মিথ্যা অপবাদ নেই যা প্রয়োগ করতে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি করেছেন। তাই আফসোস করে পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, " হায়! বড়ই পরিতাপ মানবের জন্য এমন কোন মহাপুরুষ আগমন করে নি যাকে নিয়ে তারা হাসি-বিদ্রূপ না করেছে" (সূরা ইয়াসীন)।

ভি.সি সাহেব তার বক্তব্যে বলেছেন, "আমি দু'জন বিখ্যাত কাদিয়ানী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাদের একজন হচ্ছেন স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান, আরেক জন হচ্ছেন কাদিয়ানীদের খলীফা মির্যা বশীর উদ্দিন মাহ্‌মুদ। বশির উদ্দিন মাহ্‌মুদ ছিলেন কাদিয়ানীদের ধর্মীয় নেতা মির্যা গোলাম আহ্‌মদের কনিষ্ঠতম পুত্র।" তিনি খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-কে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর কনিষ্ঠতম পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন এই যে, যাঁর সংগে আলোচনা করবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর সঠিক পরিচয় তিনি জানেন না এতেই কি প্রমাণিত হয় না যে, এটা তার একটা ভাওতা বাজী? হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহ্‌মুদ আহমদ (রাঃ) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর কনিষ্ঠতম পুত্র নন। তাঁর পরেও তিন জন পুত্র সন্তান ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) ১৯৬৫ সনে ৭৬ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রাঃ) ইন্তিকাল করেন ১৯৯১ সনে ৯২ বৎসর বয়সে। ভি. সি. সাহেবের বক্তব্যে মনে হয় যেন তিনি তাঁদের সম-সাময়িক ব্যক্তি। প্রশ্ন এই যে, বর্তমানে ভি. সি সাহেবের বয়স কত? তিনি কি যবনিকার এপারে বসেই মাসিক মদীনায় তার বক্তব্যটি পাঠিয়েছেন অথবা ওপার থেকে লিখে পাঠিয়েছেন, কি না এটা মিথ্যা ধোঁকাবাজী? ভি.সি সাহেব বলেছেন, কাদিয়ানীদের অনূদিত কুরআন মজীদ পরীক্ষা করে দেখেছি। বিভিন্ন জায়গায় পবিত্র কালামের অর্থ বিকৃত করা হয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যা সূত্রে মির্যা গোলাম আহ্‌মদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ অনুবাদটি অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত ইত্যাদি। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) খ্রীষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করতে গিয়ে কাশ্মীরে তাঁর কবর দেখিয়েছেন। তাদের ক্রুশীয় মতবাদকে দজ্জালী ফেৎনা বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলমান মৌলবীগণ খ্রীষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা -আঃ)-কে আসমানে জীবিত আছেন বলে বিশ্বাস করে এবং তিনিই আবার আসমান থেকে নেমে এসে মুসলমান জাতিকে উদ্ধার করার কল্পিত ধারণা ও তাঁর উপর বিভিন্ন খোদায়ী শক্তি প্রয়োগ করে খ্রীষ্টানদের হাতে হাত মিলিয়ে তাদের প্রচার শক্তিকে দিয়েছিলো এগিয়ে। প্রচলিত তফসীরগুলিতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় বর্ণনাগুলিকে সত্য ও সঠিক মনে করে বহু আলেম খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতঃ হয় উল্টা পথের যাত্রী। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এই সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ তফসীরের ভুল-ত্রুটিগুলি অকাট্য যুক্তি ও দলিল প্রমাণাদির দ্বারা সংশোধন করতঃ ক্রুশীয় মতবাতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে ইসলামের উপর খ্রীষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন। আহমদী জামাত কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআন করীমের তফসীরে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর প্রদত্ত সেই সকল অকাট্য যুক্তি ও দলিল প্রমাণই তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। ভি.সি. সাহেব আহমদী জামাতকে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর প্রবর্তিত ধর্ম-সম্প্রদায় বলেছেন। আহমদী জামাত হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর প্রবর্তিত কোন নতুন ধর্ম সম্প্রদায় নহে। এটা ভি.সি সাহেবের বিকৃত মন-মানসিকতারই পরিচয়ক। আহমদী জামাত সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার মনোনিত এবং মানব কুল শ্রেষ্ঠ খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। একথা শুধু ভি.সি. সাহেবের ন্যায় মৌখিক দাবী নহে। বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী কার্যাবলীই তার পরিচয় বহন করে চলেছে। আহমদীয়া জামাত কর্তৃক অনূদিত কুরআন মজীদের তফসীর বাজেয়াপ্ত করার আস্ফালন করে কোন লাভ হবে না। কেননা, এ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে। এগুলিকে একত্রিত করা ভি.সি. সাহেবের মত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। এগুলিকে একত্রিত করলে পর্বত সমান উঁচু হবে। আমরা এই অমূল্য তফসীরটি নিরপেক্ষভাব পাঠ করার জন্য প্রতিটি জ্ঞানবান, চিন্তাশীল, গবেষক, বুদ্ধিজীবী ভাইকে আহ্‌বান জানাচ্ছি। অবশেষে ভি.সি সাহবেকে বলতে চাই যে, আল্লাহ্‌তাআলার ভয়-ভীতি হৃদয়ে রেখে সত্যের অপলাপ করে বাঁকা পথে না চলে সরল, সঠিক ও সোজা পথে আসুন। করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলা বড়ই মেহেরবানীপূর্বক বিবেক নামক যে কষ্টি পাথর আপনাকে দান করেছেন, যে কারণে একদিন আপনাকে মহান আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। সেই বিবেক দ্বারা যাচাইয়ের কাজে লেগে যান। দল, মত নির্বিশেষে সকল মুসলমান আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনে বিশ্বাসী। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) হবারই দাবী করেছেন। আমরা আমাদের জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি দ্বারা যাচাই করতঃ গ্রহণ করেছি। প্রশ্ন এই যে, যদি তিনি সত্যবাদী হন, অবশ্যই তিনি সত্যবাদী, তাহলে আপনাদের অবস্থা ইহুদীদের ন্যায় হবে নাকি?

বাকী রইল হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) নবী হবেন কিনা। হ্যাঁ, তিনি নবী হবেন; তবে স্বাধীন, স্বতন্ত্র নবী হবেন না। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর অনুসারী উম্মতী নবী হবেন। তিনি নবুওয়ত প্রাপ্ত হবে বলে স্বয়ং হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন যে, " নওয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় তিনি পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন" (আহ্‌মদ - বায়হাকী) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌তাআলার নিকট আরয করলেন যে, তাঁকে যেন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার নবী বানিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ্‌তাআলা এর উত্তরে বললেন, ঐ উম্মতের নবী তাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই হবে" (হুলিয়া, আবু নায়ীম, খাসায়েসে কুবরা)। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রচিত 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তকে বলেছেন, " এ উম্মতের মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে নবুওয়াতের যোগ্যতা রয়েছে" (খতমে নবুওয়াত ১৯৯ ও ৩০০ পৃঃ)। তিনি আরও বলেছেন, " অবশ্যই হযরত (সঃ)-এর পরে তাঁর উম্মতের সংস্কার ও পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যিনি আবির্ভূত হবেন তিনি স্বীয় নবুওয়াত পদে বহাল থেকে আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রবর্তিত আদর্শ ও শিক্ষা-দীক্ষার অনুসারী হয়েই এ উম্মতের পরিশুদ্ধি ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করবেন" (মা'রেফুল কুরআন ৭ম খন্ড ১৭৬ পৃঃ)। "এ ব্যাপারে তোমাদেরকে নাক গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ্‌র বন্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে। তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী একাজ সমাধা করেন" (মা'রেফুল কুরআন- ৭ম খন্ড ৮০০ পৃঃ)

পরিশেষে প্রার্থনা করি, সত্যকে বোঝার এবং তা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা সকলের হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করে দিন, (আমীন)।

সরফরাজ এম.এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

মসীহ মাওউদ দিবস পালন

গত ২৩ শে মার্চ '৯৯ সারা বাংলাদেশের জামাতগুলোতে যথাযথ শান ও শওকতের সাথে মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবস পালিত হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, এ ঐতিহাসিক দিনটিতে অর্থাৎ ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ তারিখে লুধিয়ানা শহরের মহাল্লা জাদীদে মরহুম সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়ীতে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সর্ব প্রথম বয়াত নেয়া আরম্ভ করেন এবং এ দিন থেকেই ঐশী প্রতিশ্রুত জামাত– আহমদী জামাতের শুভ অগ্রযাত্রা আরম্ভ হয়।

এ পর্যন্ত যেসব জামাত বা সংগঠন থেকে দিবসটি পালনের খবর পাওয়া গেছে তারা হলেন : আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকা, বি, বাড়িয়া, আহমদনগর, সুন্দরবন, কুমিল্লা, তেরগাতি, বরিশাল, খুলনা ও সৈয়দপুর।

উল্লেখ্য, গত ২৬শে মার্চ যৌথভাবে বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ও ঢাকা লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগেও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস পালিত হয়।

আহমদী বার্তা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার ১২তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী '৯৯ রোজ রবিবার তারিখে খুলনা লাজনা ইমাইল্লাহ্র ১২তম বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্তাআলার ফযলে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯ ঘটিকা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত দু'টি অধিবেশনে এ অনুষ্ঠান শেষ হয়। লাজনা এবং নাসেরাতদের কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, দীনিমালুমাত এবং খেলাধূলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এতে। অনুষ্ঠানে সভানেতৃত্ব করেন জনাব রাজিয়া আক্তার প্রেঃ লাঃ ইঃ, খুলনা। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব সামসুর রহমান সাহেব, প্রেঃ আঃ জাঃ, খুলনা।

সমাপনি অনুষ্ঠানে তরবীয়তি বক্তৃতা দান করেন যথাক্রমে সর্ব জনাব সামসুর রহমান সাহেব, ডাঃ এম, এ মাজেদ সাহেব এবং আব্দুল ওদুদ সাহেব, মোয়াল্লেম। সমাপণী ভাষণ দান ও পুরস্কার বিতরণ করেন সভানেত্রী জনাব রিজিয়া আক্তার। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

গত ১২/৩/৯৯ ইং তারিখ খুলনা লাজনা ইমাইল্লাহ্ সফলতার সাথে মুসলেহ মাওউদ দিবসও পালন করেন।

মাকসুদা রহমান
সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্

৪র্থ বার্ষিক ইজতেমাঃ তারুয়া লাজনা ইমাইল্লাহ্

❑ গত ৩রা এপ্রিল। ১৯৯৯ ইং তারিখে তারুয়া লাজনা ইমাইল্লাহ্র ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্তাআলার ফযলে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার সকাল ১০.০০টা হতে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিঃ পর্যন্ত ২টি অধিবেশনের মাধ্যমে এই ইজতেমা হয়। ইজতেমায় তিলাওয়াতে কুরআন, নযম, বক্তৃতা প্রতিযোগিতাসহ ধর্মীয় সাধারণজ্ঞানের 'কুইজ' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ৪৫ জন প্রতিযোগী এতে অংশ গ্রহণ করেন। উপস্থিত সংখ্যা ছিল ৭০ জন। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান ও ইজতেমা পরিচালনা করেন মোহতারমা মাকসুদা রহমান সাহেবা, সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্। চাঁদা ও বাজেট সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখি খাকসার। জামাতের স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ মিয়াজী ও মোয়াল্লেম সাহেব ইজতেমার প্রতিযোগীদের পরীক্ষকের দায়িত্ব পালনসহ সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করেন। প্রতিযোগিতায় বিজয়িনীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতারমা সদর সাহেবা, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্।

মরিয়ম সুলতানা
সেক্রেটারী মাল, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্

লাজনার পরিদর্শন

❑ গত ২৫.৩.৯৯ তাং অপরাহ্নে লাজনা ইমাইল্লাহ্র মাহীগঞ্জ পরিদর্শন করা হয়। এক সাধারণ সভায় মাহীগঞ্জ লাজনার প্রেসিডেন্ট মিসেস আসিয়া বেগম স্বল্প সময়ের ব্যবস্থাপনায় প্রায় ২৮ জন লাজনা ও ৬ জন নাসেরাতকে উপস্থিত করান। রংপুর লাজনার প্রেসিডেন্ট মিসেস রেজোয়ানা রশিদ ও সেক্রেটারী মাল মিসেস শাহীনা আক্তার উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর

গত ২৬.৩.৯৯ ইং তারিখে রংপুর মুন্সিপাড়াস্থ মসজিদুল মাহদীতে বাদ ন্যমায জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুরের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সেক্রেটারী মাল
বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্

শুভ বিবাহ

❑ গত ১৯/০৩/৯৯ ইং শুক্রবার বাদ জুমুআ আমার একমাত্র কন্যা ইয়াসমিন সাত্তার জুঁই-এর সাথে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা সদরের উত্তর আহ্মদী পাড়া নিবাসী শেখ মোঃ ফজলুর রহমান সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ মোস্তাক আহমদ-এর শুভ বিবাহ ১০০১০১/- (এক লক্ষ একশত এক টাকা) মোহরানায় দারুত তবলীগ মসজিদে পড়ানো হয়। বিবাহ পড়ান মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরব্বী।

এই বিবাহ বরকতময় হওয়ার জন্যে আহমদী ভাই-বোনদের কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
মাদারটেক, ঢাকা

❑ মীর মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, পুলিশ লাইনের পশ্চিম পার্শ্ব, টাউন কালিকাপুর পটুয়াখালী-এর পুত্র মীর মোহাম্মদ সাখাওয়াৎ হোসেন (সোহাগ)-এর সাথে আমার একমাত্র কন্যা নূসরত জাহান তসনীম (মুক্তা)-এর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৯শে মার্চ, ১৯৯৯ই রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহ্মদীয়া মসজিদ, পটুয়াখালীতে। বিবাহ পড়ান মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী। মোহরানা ধার্য হয় ৫০,০০১ (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা।

উক্ত অনুষ্ঠানে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীরসহ সদর সাহেব, মজলিসে আনসারুল্লাহ, সেক্রেঃ অডিও, ভিডিও রিজিওনাল প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই বিবাহ বরকতপূর্ণ হওয়ার জন্য সবার কাছে দোয়ার জন্য বিশেষভাবে আবেদন করছি।

শ,ম দেলওয়ার হোসেন
শিকদার বাড়ী, পটুয়াখালী

❑ গত ২৬/২/৯৯ তারিখ পৈরতলা, বি, বাড়িয়া নিবাসী মরহুম লোকমান মিয়ার পুত্র জনাব মোহাম্মদ জসীম উদ্দীনের সাথে ভাদুগর, বি, বাড়িয়া নিবাসী জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর কন্যা নাসরীন আক্তারের বিয়ে সুসম্পন্ন হয় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা মহরানা ধার্যে। বিয়ের এলান করেন মোয়াল্লেম মজিদুল ইসলাম বি, বাড়িয়া মসজিদে।

Announcement of Nikah

On 02-04-1999 after Juma Prayer my Nika was announced with Rashida Yasmin (Ruby) D/0 Late Tajedul Islam Talukdar, Ahmadiyya Muslim Jamaat of Kukua by Maulana Abdul Awwal Khan Chauddhury. Sadar Murabbi in Darut Tabligh Masjid, Dhaka. The Dowery has been fixed at $ 5000.00 (Five thousand Dollor) only.

May Allah bless us both and make blessing for all the Ahmadiyya Jamat.

Fazal-Ur- Rehman Qureshi
S/O Late Abdur Rahman Qureshi of kenya Jamat
95 Main Road, Kilifa. P.o. Box 937, Kilifi, Kenya.

শুভ বিবাহ

❑ গত ২-৪-৯৯ তারিখ উত্তর আহমদী পাড়া বি, বাড়িয়া নিবাসী জনাব মোহাম্মদ লতিফুর রহমানের পুত্র জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান (লিখন) এর সাথে একই স্থানের বাসিন্দা জনাব আবূ জাহিদের কন্যা মোসাঃ সাদিয়া সুলতানার বিয়ে সুসম্পন্ন হয় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার এক টাকা) মহরানা ধার্যে।

বিয়ের এলান করেন মোয়াল্লেম মজিদুল ইসলাম বি, বাড়িয়া মসজিদে।

উভয় বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্যে সকলের নিকট দোয়ার দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আবদুল কাদির ভুইয়া
ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা

শোক সংবাদ

❑ আমার মা (মোসাম্মৎ আঞ্জুবেন নেছা) গত ১৩ মার্চ '৯৯ রোজ শনিবার দুপুর ১.১০ মিঃ নোয়াখালীর শরীফপুর গ্রামের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে . . . রাজেউন)। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। তিনি একজন পরহেযগার মুত্তাকী, গরীবদের সাহায্যকারিণী, মানব সেবাকারী হিসাবে জীবন-যাপন করেছেন।

মৃত্যুর সময়ে তিনি ৩ পুত্র, ৪ কন্যা এবং বহু সংখ্যক নাতী-নাতনী, পৌত্র-পৌত্রী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁকে দারাজাতের বুলন্দী ও জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করেন সেজন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত

❑ আহমদীয়া মুসলিম জামাত মেরীগাছা-এর সদস্য আমার বড় ভাই জনাব আলী গত ১৩/৩/৯৯ তারিখ রোজ শনিবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৫২ বছর বয়সে নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যু কালে ৭ ছেলে, ১ মেয়ে ও অনেক নাতী-নাতনী রেখে যান। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সাবরে জামীল ও তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনায় জামাতের সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

নঈম আহমদ, মোয়াল্লেম

শোক সংবাদ

❑ আমার কন্যা সায়েরা আহমদ (ডেজী) গত ২৬শে মার্চ ৯৯ সকাল ৯টায় দীর্ঘ দিন ক্যান্সার রোগে চিকিৎসাধীন থাকার পরে আমেরিকার লজএঞ্জেলেসে ইন্তেকাল করে (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৩৩ বছর। সে স্বামী ও ২ পুত্র রেখে গেছে।

তার রূহের মাগফেরাতের জন্যে ও আমাদের পরিবারের সাবরে জামীলের জন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

হেলাউদ্দীন আহমদ, আমীর
নারায়ণগঞ্জ জামাত

পাকিস্তান এশিয়ান টেস্ট ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন

❑ ১৬ মার্চ' ৯৯ ।। পাকিস্তান এখন এশিয়ান টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম চ্যাম্পিয়ন। রানার্স আপ শ্রীলঙ্কা। ভারত সবচে' পেছনে পড়া দল।

মন্ত্রিসভা বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদিত

❑ ১৬ মার্চ '৯৯ ।। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক স্তরে একীভূত অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি চালুর উদ্দেশে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি গতকাল মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। এরপর প্রথম বারের মত এই শিক্ষানীতি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে।

দাখিল পরীক্ষা ব্যাপক নকলের অভিযোগ

❑ ১৬ মার্চ '৯৯।। সারাদেশে দাখিল পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে ব্যাপক নকল চলছে। বেঞ্চে, টেবিলে বই-কিতাব রেখে খাতায় লেখার ঘটনা সাধারণ দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও বা কেন্দ্রের বাইরে খাতা পাঠিয়ে লেখা হচ্ছে এ অভিযোগ কম নয়। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে পরীক্ষার্থীদেরকে সুযোগ নামে আগে 'খরচাপাতি' নামক ফি (?) নেয়া হয়ে থাকে। মহান ইসলাম ধর্মের মহান আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মের নামে এইসব অধর্ম কার্যকলাপ ও কেলেঙ্কারি দেখে স্কুল কলেজও লজ্জা পায়।

ঢাকায় সার্ক স্পিকারদের সম্মেলন ১৯ মার্চ

❑ ১৭ মার্চ '৯৯ সার্কভুক্ত দেশসমূহের স্পিকার ও পার্লামেন্ট সদস্য সমিতির ৩দিন ব্যাপী সম্মেলন আগামী ১৯ মার্চ শুক্রবার ঢাকায় শুরু হবে।

দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে মাত্র ৩ বস্তা নকল উদ্ধার!

❑ ২১ মার্চ '৯৯।। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত চলতি দাখিল পরীক্ষায় মির্যাগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে গতকাল তালবে এলেম পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশী করে মাত্র ৩ বস্তা চিরকুট ও বইয়ের পাতার নকল উদ্ধার পরে তা নদীতে ফেলে দেয়া হয়।

জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রের উদ্বোধন

❑ ২১ মার্চ '৯৯।। আজ সিলেটের জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

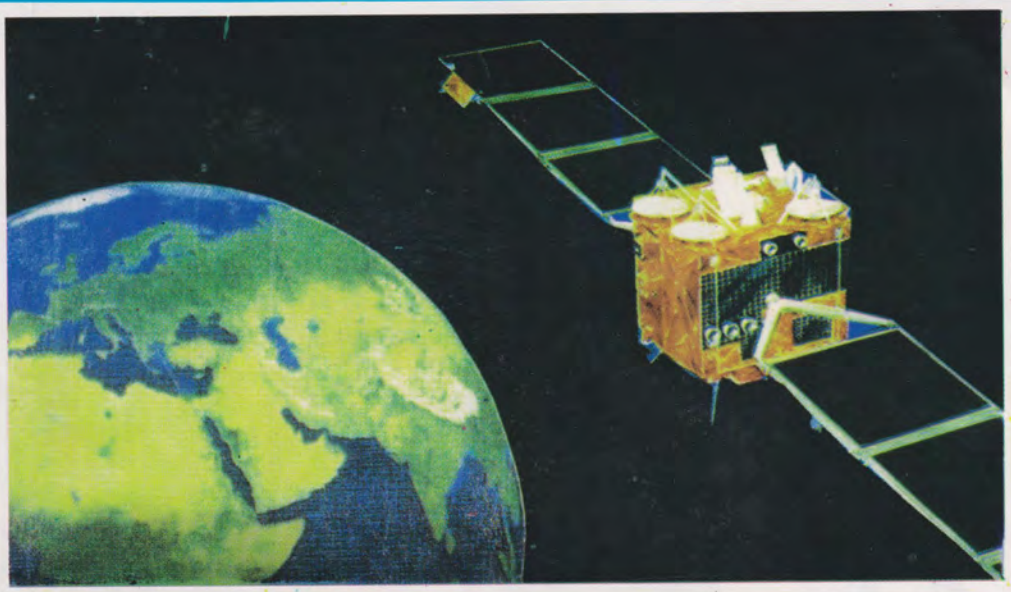

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

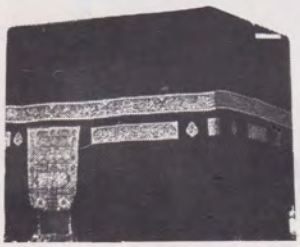

Muslim MTA AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্রে

দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার কুরআন ক্লাস
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- এমটিএ-এর দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রোগ্রামগুলো দেখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

New Vol. No. 61 ❑ 19th Issue

April 15, 1999 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

QUALITY IS OUR TRADITION

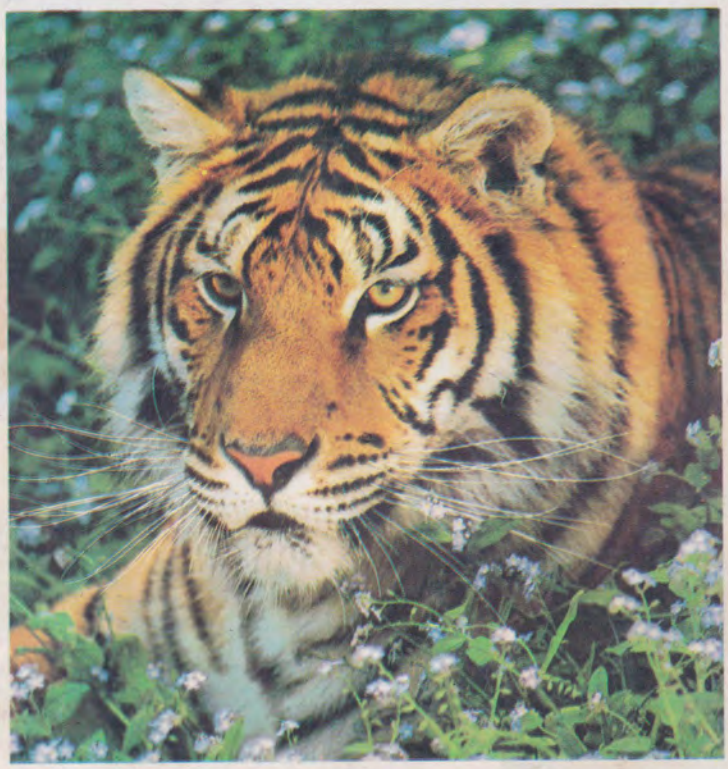

AMEGON

এমিকন

HEAD OFFICE : H-79/3, BLOCK-E, BANANI CHAIRMAN BARI, DHAKA-1213, BANGLADESH, TELEFAX : 880-2-884945, TEL : 605331

BRANCH OFFICE : 205, BAIZID BOSTAMI ROAD, BAIZID BOSTAMI , CHITTAGONG. PHONE : 682216

SPECIALIST IN ADVERTISING, DESIGN, PRINTING HOARDING, DECORATION, PLASTIC & METAL SIGN ARMY CRESTS, WOODEN & STEEL. FABRICATION WORK, SCULPTURE & MODELING.

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 9662703, 505272